রবির আলো

মণি বাগচি

চিনকো
১৬৭ এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক
মণি বসু
চিনকো
১৬৭এন্, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদশিল্পী
আল্‌ফাবিটা

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

রবীন্দ্রকাব্যরসরসিক

শ্রীঅমল হোম

করকমলেষু।

এই লেখকের অন্যান্য বই

মাইকেল

নিবেদিতা

রামমোহন

বিদ্যাসাগর

কেশবচন্দ্র

গৌতমবুদ্ধ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র

শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার

সহস্র-চিত্ত রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর কবি।

ইতিহাসের এক দুর্লভ লগ্নে পাওয়া তিনি। আনন্দঘন পুরুষ। সহস্ররশ্মি সূর্য তিনি। রশ্মি তাঁর বাঙ্ময় ঝঙ্কার। এত বড়ো বিরাটের সম্পূর্ণ পরিচয় কে-ই বা দিতে পারে? মনের জানালা দিয়ে রবির আলো যতটুকু দেখেছি, যতটুকু বুঝেছি সেই ভাস্বর স্ফটিকস্বচ্ছ কাব্যচেতনা, তাই-ই আভাসিত হয়েছে এই বইখানিতে। এই শ্যামলা পৃথিবী, এই নদীপ্রান্তর অরণ্য, রবির আলোয় উদ্ভাসিত। এ যুগের মানুষের সেই মহাকবিকে, নিখিল-ভুবনমানস উজ্জ্বল-করা সেই আলোককে, নবযুগের সেই প্রদীপ্ত অভিজ্ঞানকে জানাই প্রাণের নম্র নতি আর তাঁরই উদ্দেশে বলি ঃ

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।

মণি বাগচি

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন

এক

ছ'নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

সেইখানেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

'বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্নের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজমান।'

এ-বাড়ি শুধু একটি ধনী পরিবারের বাস্তুভিটা নয়। এ যেন দুই যুগের সাক্ষী একটি বিরাট দুর্গপ্রাসাদ। তিনটি সভ্যতার ছাপ আছে এর প্রাচীরে প্রাচীরে আর কত যে ইতিহাস এর সোপানে সোপানে, খিলানে খিলানে। উনিশ শতকের নবজাগরণের দীপ্তিচ্ছটা প্রথম বিকীর্ণ হয়েছিল সারা দেশে এইখান থেকেই। অনেক ঘর, অনেক মহল আর অনেকখানি বাগান—এই মিলিয়ে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—এই বাড়ির 'এই তিন কর্তা পরপর।'

দ্বারকানাথকে দিয়েই এ-বাড়ির ঐশ্বর্যের সূচনা। ঠাকুরপরিবারের ধন, মান, প্রতিপত্তি যা কিছু সবই তাঁর সময় থেকেই। তিনি ছিলেন সে-যুগের কলকাতার একজন বড়ো ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী বললে ঠিক বলা হয় না। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান দাতা, সর্বজন অন্বেষিত পরামর্শ-দাতা আর ভদ্র সমাজের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি। রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামী ও অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বারকানাথই ছিলেন প্রধানতম। এগারো বছর ধরে নিমকমহালের দেওয়ানি করবার পর দ্বারকানাথ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ব্যবসায়ের সঙ্গে ছিল জমিদারী—এই ছিল তাঁর ঐশ্বর্যের সোপান। তাঁর ঐশ্বর্যের কাহিনী আরব্যোপন্যাসের গল্পের মতো। ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছিল সহৃদয়তা, বদান্যতা আর বিলাসিতা। বেলগাছিয়ার সুরম্য বাগানবাড়িটি ছিল দ্বারকানাথের বিলাস-নিকেতন।

তার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক দেখে ইংরেজরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি যখন লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি মাসে এক লাখ টাকা করে খরচ করতেন—তখনকার দিনের লাখ টাকা! সেখানকার লোকেরা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল 'প্রিন্‌স্'। ঐশ্বর্য, বিলাসিতা আর বিষয়বুদ্ধি—এর মধ্যেই কিন্তু প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের বন্ধু; বন্ধুর আদর্শের প্রভাব অনেকটা গিয়ে পড়েছিল তাঁর ওপর। অত্যন্ত সংস্কৃতিবান্ মানুষ ছিলেন তিনি। দেশের সকল শুভকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর।

এই দ্বারকানাথের বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলার নবজাগৃতির সূচনাকালেই তাঁর জন্ম। উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতি—এমন দিক নেই যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত হোয়ে না উঠেছিল। দ্বারকানাথের পুত্র তিনি, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রামমোহনের চিন্তাধারার প্রধান উত্তরসাধক। তাঁরই জীবনজ্যোতিতে একটি শতাব্দীর জীবনধারা উদ্ভাসিত। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথই বিরাট পুরুষ। বিরাট এবং মহৎ। উপনিষদের ভাবমূর্তি দেবেন্দ্রনাথ; তাঁর সমস্ত জীবনের ইতিহাস ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের ইতিহাস। তাঁর মধ্যে ছিল একটা অসীমাভিসারী চিত্ত। প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথের সহস্র চেষ্টাতেও তা বৈষয়িকতার গভীরে বাঁধা পড়ে নি। বিষয়ের দায়িত্বকে স্বীকার করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু বিষয়ের বন্ধনকে করেছিলেন অতিক্রম। চেতনা ছিল তাঁর ব্রহ্মাভিমুখী। মন ঘুরে ফিরেছে হিমালয়ের দুর্গমতায় আর বোলপুর-সুরুলের জনমানবহীন মহাপ্রান্তরে। অথচ তিনি নিতান্ত অন্তর্মুখীন নির্জনতা বিলাসী মানুষ ছিলেন না। তাঁর মুক্তশুদ্ধ মানস তাঁর চেতনাকে করেছিল সত্যাভিমুখী। তাঁর জীবন নিবিড় সত্যানুভূতির জীবন। ধন ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে তিনি ধর্মপ্রচার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ

যুগ-স্রষ্টা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের তিনি যেমন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তেমনি সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। একদা ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্রের একটি শ্লোক ভোগবিলাসে মগ্ন এবং ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ দেবেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে-বিপ্লব এনে দিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। এই উপনিষদই ছিল তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। তাঁর চিন্তা-ভাবনা সব কিছু এই উপনিষদের ভাবধারায় ছিল পরিস্নাত।

তত্ত্ববোধিনী সভা আর তত্ত্ববোধিনী কাগজ—দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই হোল দুটি মহৎ কীর্তি। তত্ত্ববোধিনীর যুগ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একটা স্বর্ণযুগ। এই যুগের নায়ক দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন, সমাজ সংস্কার, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস, খ্রীষ্টান পাদ্রিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এসবই সেদিন তত্ত্ববোধিনীর মঞ্চ থেকে করা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার ওপরই জোর দেন নি, দেশের রাজনীতির কথাও চিন্তা করেছিলেন। সেই চিন্তার পরিণত রূপ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন; তিনিই ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। নবীন, প্রাচীন, সনাতনী ও বিপ্লবীর মিলনস্থল ছিল এই অ্যাসোসিয়েশন। সেদিন এই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভারতের জন্য স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে যে স্মারকলিপি বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাঠানো হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর ছিল দেবেন্দ্রনাথের। এই ছিল সেদিন পরাধীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দাবী। এ-ঘটনা কংগ্রেসের জন্মের তেত্রিশ বছর আগের কথা। জীবনের সকল অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অবিচলিত—অপরাজিত চিত্তেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের গুরুভার বহন করেছেন। উপনিষদের সেই মহৎ বাণী—ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যেন বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের আমলেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সারা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পীঠস্থানরূপে গণ্য হয়েছিল। এইখানে বসেই তিনি সমগ্র দেশের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতেন, আর এইখানেই তিনি আকর্ষণ করেছিলেন সকলকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসে মিলেছিল তিনটি সভ্যতা—হিন্দু, মুসলমানী আর ইংরেজি। এ-বাড়িতে খুব ঘটা করে দুর্গোৎসব হোত। কুমোরেরা বাড়িতেই প্রতিমা নির্মাণ করতো। পূজোর তিন দিন বাড়ির উঠানে যাত্রা হোত। দেবেন্দ্রনাথ তো পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে সরস্বতী পূজোই করেছেন। দেউড়িতে দারোয়ান আর জুড়িগাড়ির ভিড়, বাবুদের বসবার ঘরের দরজায় এক-একজন করে হরকরা; বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো; মাঝখানে মছলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উঁচু আসনে কর্তা বসতেন; নীচের ফরাসে অভ্যাগত আর মোসাহেবরা বসতেন—ঠিক যেন নবাবী আমলের চাল ও কায়দা। তারপর মুঘল যুগের সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজি সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চললো—জয়ী হোল ইংরেজি সভ্যতা। বৈঠকখানার সে-গদীপাতা বিছানা উঠে গেল, তার জায়গায় এলো ড্রয়িং রুম আর বিলিতি ফার্ণিচার। আগে এ-বাড়ির কর্তা ও ছেলেদের পোশাক ছিল চোগা, চাপকান, কাবা, পাগড়ি; তারপর তার বদল হোয়ে দেখা দিল হ্যাট্‌ কোট্‌, ওয়েষ্টকোট আর পেণ্ট্‌লন। ভাষায় ছিল আগে ফারসি ও আরবি শব্দের আধিক্য, তারপর হোল ইংরেজি। বড়মানষী আহার তখন ছিল কালিয়া-পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব, প্রভৃতি মোগলাই রকমের; তারপর সেখানে ধীরে ধীরে দেখা দিল ইংরেজি মতে চপ, কাটলেট্‌, পুডিং ইত্যাদি। এইভাবে হিন্দু, মুসলমানী ও ইংরেজি—এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হয়েছে এই বাড়িতে। এই তিন সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গম হোয়েছে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়িতে। কালে কালে সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির কত বদলই হোল। তোষাখানা হোল ড্রামাটিক ক্লাব। দপ্তরখানা হোল গ্রীন্‌ রুম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির

সামাজিক ইতিহাস, উনিশ শতকের বাংলারই সামাজিক ইতিহাস। রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ এই বাড়ি। শালের পাগড়ি মাথায় বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন এ-বাড়িতে; তারো আগে এসেছেন রামমোহন, এসেছেন চটি-চাদরে বিদ্যাসাগর; এই বাড়িতেই জাজিমের ওপর বসে ভাঙা গলায় টানা সুরে মাইকেল আবৃত্তি করেছেন মেঘনাদবধ কাব্য; বিহারীলাল গেয়েছেন সারদামঙ্গল, তানপুরা হাতে নিয়ে সঙ্গীত-পাগল শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে-ঘরে গান গেয়ে ফিরেছেন; এই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতো কত রাজা-মহারাজা ও লাট-বেলাটের গাড়ি; এই বাড়িতেই এলেন শিল্পী ওকাকুরা, তপস্বিনী নিবেদিতা। 'এমনি যুগে যুগে কত না আগন্তুকের পদচিহ্ন পড়িয়াছে এই বাড়িতে--রামমোহন হইতে গান্ধী! উনবিংশ শতকের ব্রহ্মমুহূর্ত হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে বৃটিশ রাজত্বের উপান্ত! সদ্যজাগ্রত আভিজাত্যের আদি হইতে ক্লান্তপ্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুগান্ত। নব্যবঙ্গ-সংস্কৃতির সমগ্র সুরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়।'

জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। দেবেন্দ্রনাথের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের জন্ম—এ দুটিই মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে একই বছরের (১৮৬১ খৃঃ) ঘটনা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ তখন অতিক্রান্ত। মহাকালের রথের চাকা আরো দশ বছরের পথ উত্তীর্ণ হয়েছে। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস যখন তার সকল বর্ণচ্ছটা নিয়ে ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে, সেই সুলগ্নেই জন্ম রবীন্দ্রনাথের।

দুই

'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

জোড়াসাঁকোর বিশাল ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের একটি নিভৃত ঘরের মধ্যে বসে শিশু রবি পড়ছেন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মর্চে-পড়া তলোয়ার খাটানো দেউড়ি; ঠাকুরদালান। তিন-চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। ...কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি। অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত। বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত। হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর। বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁই-হুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইয়ো হাঁক্। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ। লাজুক নীরব নিশ্চঞ্চল।'

সেই কোণের মানুষ, সেই লাজুক নীরব নিশ্চঞ্চল বালক কেমন করে বিশ্ববরেণ্য কবি হয়ে উঠলেন, কেমন করে রবির আলো বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ল, সেও এক রূপকথার কাহিনী। আজ থেকে শতবর্ষ পরে বাংলার এক নিভৃত পল্লীভবনে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রহরে বসে কোনো

কুতূহলী বালক তার মা-কে যখন জিজ্ঞাসা করবে—'মা, রবি ঠাকুরের গল্প বলো,'—তখন সেই রূপকথার কাহিনী মা তাঁর ছেলেকে শোনাবেন। এমনি করেই বাংলার মায়েরা যুগ-যুগ ধরে তাঁদের ছেলেদের কাছে বলবেন নিখিল ভুবন আলো-করা এই রবীন্দ্রনাথের জীবনের অত্যাশ্চর্য কাহিনী। কাহিনী নয়—ইতিহাস। সে-ইতিহাস তোমার, আমার, সকলের। 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'—তেমনি বাঙালীর চিত্তশতদলের রূপ মন্থন করেই বুঝি বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথ!

বিধাতার এক অনন্যসুন্দর দুর্লভ সৃষ্টি।

ক্ষণজন্মা পিতার তিনি ক্ষণজন্মা পুত্র।

ইতিহাসের বরপুত্র তিনি।

উনিশ শতকের নবজাগরণের উদার গগনে একেশ্বর সূর্য রবীন্দ্রনাথ।

নিরবধি কালের অঙ্কে চলমান কালের সর্বোত্তম উপহার তিনিই।

আকাশের রবি বাংলার শ্যামল আঙিনায় নেমে এলো একদিন—তার আলোয় বিশ্বভুবন হোল আলোকিত। প্রকৃতি হোল মুখর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবি হলেন বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ। মানব-সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরদেশে সহস্রাংশু সূর্য রবীন্দ্রনাথ। ভারতের তিনি গর্ব, পৃথিবীর গৌরব তিনি। জগৎ কবি-সভার মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর মূর্তি সুন্দর, তাঁর বাক্য সুন্দর, তাঁর কাব্য সুন্দর—তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর। সৌন্দর্যের শেষ কথা রবীন্দ্রনাথ—সৌন্দর্য-বোধের শেষ সীমান্ত তিনিই। সেই একদিন যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলো এসে তাঁর সমস্ত সত্তাকে দীপ্তিমান্ করে তুলেছিল—সেই তো রবীন্দ্রনাথের জীবনের আসল ইতিহাস। শতাব্দীর পটে প্রদীপ্ত আলোকশিখা তিনি। শতবর্ণের সেই আলো তোমার আমার সকলের অন্তরকে যেন আলোকিত করে তুলেছে। এ-আলো অনির্বাণ। এ-জ্যোতিপ্রবাহ

অম্লান। এসো, আজ আমরা সবাই মিলে এই নির্মল আলোকধারায় স্নান করি আর বলি ঃ

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন ॥

রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্রই পরিচয় আছে।

তিনি কবি। শুধু বাঙালীর কবি নন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি।

বিশ্বমানবের কবি তিনি।

তাঁর কবিপ্রতিভার উদ্বোধন হয় নিতান্ত বালককালেই। আমরা কল্পনা করতে পারি—সেই বিশাল ঠাকুরবাড়ির দোতলার ঘরের কোণ থেকে সংকীর্ণ জালের ভিতর দিয়ে বাইরের প্রকৃতির যেটুকু অংশ মুগ্ধ বালকের দৃষ্টিগোচর হোত—সেই বার-বাগানের পুকুরের একধারের কোণে ঝুরি-নামানো চীনা বটগাছ। জলে পাতিহাঁসের সাঁতার আর প্রতিবেশিদের নিত্যনিয়মিত স্নান, প্রাঙ্গণে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা—এইসব দেখে দেখে ও তার ওপর শিশুকল্পনার বিচিত্র রঙ ফলিয়ে বালক রবির শৈশবের নিঃসঙ্গ নির্জন দিনগুলো গড়িয়ে যেত। সন্ধ্যা হোল। চাকরদের কাছে শোনেন যত রাজ্যের গল্প ; রাতে মা-দিদিমার মুখে শোনেন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। দিনের কল্পনা মূর্ত হোয়ে উঠত যেন রাত্রিতে। সেই সঙ্গে ছেলেভুলানো ছড়ার তালে তালে আন্দোলিত হোয়ে উঠত শিশুকবির মন। গাছের পাতার মর্মর গুঞ্জনে, শ্রাবণ ধারার ঝর্ঝর তানে আর 'সেই জল পড়ে পাতানড়ে' ছড়ার তালেই কবি-চিত্তের প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল। বাইরে মিশবার স্বাধীনতা ছিল না, তাইতো বালক রবি তাঁদের জোড়াসাঁকোর সেই বিশাল অট্টালিকার মধ্যে বন্দী থেকেও সকাল-সন্ধ্যায় আলোছায়ার জোয়ারভাঁটা, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে রৌদ্রের প্লাবন, আষাঢ়ের মেঘেঢাকা দিন, শ্রাবণের ধারামুখর রাত, দাশুরায়ের পাঁচালির ঝঙ্কার, কৃত্তিবাসের

পয়ারের করুণ একতান—এইসবের ভেতর দিয়ে বাইরের রূপ আর রসের পৃথিবীর সঙ্গে মিলবার চেষ্টা করতেন।

এমনি করেই বাইরের প্রকৃতি শিশুরবির কল্পনায় বিচিত্র রঙ ফলিয়ে যেত আর এমনি করেই কাটত রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার সেই নিঃসঙ্গ নির্জন দিনগুলো। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়েছিল 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে আর ঘরে পড়াশুনা চলেছিল কিছুদিন মাধব পণ্ডিতের কাছে। তারপর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনার বাইরে বালককে আরো অনেক কিছু পড়তে হোত বাড়ির মাস্টারের কাছে। তার ওপর ছিল ছবি-আঁকা শেখা আর জিম্‌নাসটিক। এইভাবে গেল কিছুদিন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে এলেন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। সেটা ছিল সাহেবদের স্কুল। এমনি করে কেটে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দশ-এগার বছর। এই বয়সেই তিনি পাঠ্য বই যত পড়েছিলেন, তেমনি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে নিয়ে অ-পাঠ্য বইও কম পড়েন নি। এমনি করেই সেই বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে ঘটল বিশ্বপ্রকৃতির যোগ—বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক জিনিস যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলত।

লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিলন স্থান ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। রবীন্দ্রনাথের পিতা-পিতামহ ছিলেন ধনী—সে ধনৈশ্বর্যের তুলনা নেই। তবু ভাবলে অবাক হোতে হয় যে, অত বড়ঘরের ছেলে হোয়েও তাঁর শৈশব কেটেছে খুবই সাদাসিধা ভাবে। বাবুগিরি বা বিলাসিতার নাম-গন্ধও ছিল না। কবি নিজেই লিখেছেন: 'আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানীর আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে একটা সাদা জামা-ই যথেষ্ট ছিল।' অনেক গুণী লোকের যাওয়া-আসা ছিল এই বাড়িতে। অক্ষয় দত্ত আসতেন, রাজনারায়ণ বসু

আসতেন—আসতেন কত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক আর দার্শনিক। এঁরা সবাই আসতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আকর্ষণে। এইসব জ্ঞানী ও গুণী লোকদের সঙ্গলাভ করে সেই বয়সেই অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় আরেকটা জিনিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেটি হোল উপনিষদ্। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক সুনিবিড় সম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের বারো বছর পূর্ণ হোতে আর তিনমাস বাকি আছে। অনেকদিন প্রবাসে কাটিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ির কর্তা তিনি, তাই তিনি যখন কলকাতায় থাকতেন, 'তখন তাঁহার প্রভাবে সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত।' এবার মহর্ষি এসেছেন ছেলের পৈতা দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ নূতন ব্রাহ্মণ হলেন; মুণ্ডিত মস্তক। খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য বুঝবার মতন বয়স তখন বালকের নয়, তবু একদিন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাধানো মেঝের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল।' কিন্তু সবচেয়ে ভাবনা হোল এই মাথা মুড়ানো অবস্থায় তিনি স্কুল যাবেন কি করে। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ তেতলার ঘরে তাঁর ডাক পড়ল। সেই ঘরে থাকতেন মহর্ষিদেব। এতটা বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন তাঁর বাবার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ পান নি।

—হিমালয়ে যেতে চাও?

—চাই।

কিশোর রবি চললেন তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে।

হিমালয়ে যাবার পথে পিতাপুত্র কয়েকদিন বোলপুরে থেকে গেলেন। এইখানেই মহর্ষি পেতেছিলেন তাঁর ধ্যানের আসন, রচনা করেছিলেন

শান্তিনিকেতন। চারদিকে ধু ধু করছে দিগন্ত প্রসারী মাঠ—দূরে তালগাছ ঘেরা ভুবনডাঙা গ্রাম। চারদিকের পরিবেশ যেমন শান্ত, তেমনি নির্জন। তাঁর দুই চোখ যেন দশ চোখ হয়ে চারদিকের অবারিত সৌন্দর্য দেখতে লাগল। বালকের আনন্দের সীমা রইল না। এখানে চাকরদের শাসন নেই। চারদিকে মাঠ ধু ধু করছে—মাঠের মাঝে মাঝে খোয়াই। ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানোর সে কী আনন্দ। সেই সঙ্গে পিতার নিবিড় সান্নিধ্যও লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই তিনি প্রথম বুঝলেন যে সংসারের সকল কাজ করেও মহর্ষির জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের আরাধনা। বোলপুরের প্রান্তরের নির্জন গরিমার মধ্যে বাবাকে কাছে পেয়ে, তাঁর ফাইফরমাস খাটবার সুযোগ পেয়ে আর সেই সঙ্গে আপন মনে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়ে—বালকের মনে সে কী আনন্দ। সেই আনন্দ তাঁর প্রকাশ পেল কাব্যরচনার ভেতর দিয়ে।

তারপর বালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষিদেব এলেন হিমালয়ে। ডালহৌসী পাহাড়ে বক্রোটা শৈলশিখরে চারমাস ছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। কবি তাঁর এই প্রথম প্রবাসজীবনের স্মৃতি তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন : 'বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। তখন শীত অত্যন্ত প্রবল। এখানেও আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই। নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবনে আমি প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলো প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের রেখাবলী। ...রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রলোকের অস্বচ্ছতায় পর্বত চূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।'

দেবতাত্মা হিমালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। রাতের অন্ধকারে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় পিতাকে উপাসনারত দেখে আর দূরে বরফ-জমা পাহাড়, পাহাড়ের

চারদিকে পাইন-বন দেখে উদ্‌বোধিত হোত বালক-রবির চিত্ত। রবীন্দ্রনাথের চিত্তের সেই উদ্‌বোধনের কাহিনীর মধ্যেই আছে ভারতের শাশ্বত আত্মার জাগরণের ইতিহাস। গগনচুম্বী তুষার-মৌলি হিমালয় আর দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্র—ভারতের আত্মাকে এদেরই মধ্যে পাওয়া যায়।—এই শিক্ষাই সেদিন বোধ হয় শিশুরবি তাঁর পিতার অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করলেন। সেইদিন থেকেই কবির চিত্ত হোল অসীমাভিসারী। হিমালয়ের দিগন্তপ্রসারী ধ্যান-গম্ভীর সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে অতীত ভারতবর্ষের রূপময়ী রহস্যময়ী যে মূর্তি সেদিন নির্জন শৈলশিখরে ধ্যানী পিতার পাশে বসে বালক-কবি তাঁর অপরিণত কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই মূর্তিই ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায়, তাঁর উদ্দীপ্ত চেতনায় শতবর্ণের আলোকে।

ইতিহাসের দিগন্ত আজ তাই রবির আলোয় উদ্ভাসিত।

তিন

বালক বয়সেই অসীমের রহস্যকে সারা দেহ-মন দিয়ে অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। উপনিষদে আমরা বালক নচিকেতার গল্প পড়েছি। মৃত্যুর অন্ধকারময় গুহায় তলিয়ে গিয়ে অমৃতের উদ্ধার করে এনেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বালক বয়সে অনুভব করেছেন পৃথিবীর রূপ আর রহস্য। সেই তার ছেলেবেলার কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন ঃ 'এক একদিন মধ্যাহ্নে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম……দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা শহরের নানা উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমা মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। সেইসকল অতিদূর বাড়ির ছাদে একটি চিলাকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজ-ভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলির মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক্য কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত……তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস হইয়া যাইত।'

এ সেই বয়সের কথা যখন পৃথিবীর চারদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। তবু সেই বয়সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে আর বৈচিত্র্যে কবি আনন্দ উপভোগ করতেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। আশৈশব তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ। হিমালয়

থেকে ফিরে এলে দেখা গেল ঠাকুরবাড়ির সেই সুবিশাল অন্তঃপুরে বালক রবির জন্য শাসনের কড়াক্কড়ি আর রইল না। তিনি খুশিমতো সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াবার অধিকার পেলেন। শুধু তাই নয়। এখন থেকে তাঁর মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন দখল করে বসলেন। শাসন ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্কুল যাবার টানও কমে আসতে লাগল। তেরো বছর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথের মা মারা গেলেন। তখন থেকেই বাড়িতেই তাঁকে ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থা হোল। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা—সবই তিনি পড়তেন। অধ্যয়ন ছিল ঠিক তপস্যার মতন। এমন কোনো বাংলা বই তখন ছিল না যা রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই ভাল করে না পড়েছিলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতো কবিতা-রচনা। সেই সঙ্গে গানও। জ্ঞানী এবং গুণীতে ভরা ছিল তখন জোড়াসাঁকোর দেবনিকেতন। সাহিত্যের চর্চা যেমন সেখানে ছিল, তেমনি তাঁদের বাড়িতে দিনরাত বইত গানের হাওয়া। কিশোর রবির মন গানের রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির সকলের ছোট তিনি—তাই সকলের স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন অজস্র ধারায়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজিতে সুপণ্ডিত; সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যের ও সংগীতের একজন দক্ষ শিল্পী। কাব্য গান চিত্র নাটক অভিনয়—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন এই পঞ্চপ্রদীপের আরতির সমারোহ ছিল নিত্য সকাল-সন্ধ্যায়। সেই সঙ্গে মিলেছিল আরেকটি জিনিস—স্বাদেশিকতা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সেদিন ছিল স্বাদেশিকতার পীঠস্থান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল স্বদেশের ওপর। গৃহস্বামীর এই স্বদেশপ্রীতির ভাবটি তাঁর সকল পুত্রই লাভ করেছিলেন—বেশি করে লাভ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ।

এই বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেই কিশোর রবির শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। আর সেই বয়সেই ভাব-রাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য বালক রবির কাছে উদ্ভাসিত হোত।

এমনি করেই হোল একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ—এক বিপুল কবিপ্রাণ সহসা যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল ঃ

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি ;
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

আমাদের কাহিনী এইখান থেকেই শুরু। তরুণ কবির উদ্দেশ্যহীন জীবনে এইবার যেন জীবনের সুস্পষ্ট ভূমিকা ফুটে উঠল—এক নূতন পথে উৎসারিত হোল তাঁর কাব্যধারা। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের শিখরদেশে ফুটে উঠল ধ্রুবতারা। আত্মচেতনার ধ্রুবতারা। মুক্তগতি নূতন ছন্দে হোল তাঁর কবিচিত্তের বাঞ্ছিত উদ্বোধন। বিপুল গভীর আবেগে ও পুলকে জেগে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। পৃথিবীর আনন্দ আর সৌন্দর্যের মূর্তি তাঁর চোখের সামনে সুন্দরভাবে খুলে গেল। তাঁর রুদ্ধ প্রতিভা-নির্ঝরিণী এইবার যেন প্রকাশের মহাসাগরের ডাক শুনতে পেল। ফুলের মতন পূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। রবির আলো এইবার নিখিল ভুবনে ছড়িয়ে পড়বার শুভক্ষণ এলো। আমাদের কাহিনী সেইখান থেকেই আরম্ভ।

জীবনপ্রভাতে নবরবির আলোকচ্ছটা নিয়ে জেগে উঠলেন কবি—জেগে উঠল তাঁর কবি-মানস। রবির কিরণে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে নিখিল ভুবনে তিনি চাইলেন তাঁর প্রাণ ঢেলে দিতে। তিনি বললেন ঃ

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

সেই তাঁর কথা, গান আর সর্ব বাধাবন্ধন ছিন্নকারী প্রাণের ইতিহাসই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। জোড়াসাঁকোর রবি, বাংলার রবি কি করে নিখিলভুবনের চিত্ত আলো-করা রবি হলেন আর কেমন করে সেই রবিকরদ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠল শতাব্দীর পটভূমি—তাঁর বহুভঙ্গিম জীবনের সেই সাধনার কথাই রবীন্দ্রনাথের

জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। তাঁরই কথা, তাঁরই গান আর তাঁরই প্রাণকে অবলম্বন করে সেই ইতিহাসের অন্তঃপুরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। তাঁর জীবন-অনুভূতি আর জগৎ-ভাবনার মধ্যেই আছে তাঁর জীবনের মর্মকথা। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' বনস্পতির মতন বিশাল এবং অভ্রংলিহ রবীন্দ্রমানসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার এই হোল স্বর্ণসূত্র। জীবনপ্রভাতেই বেজে উঠল জীবনের মূল সুরটি—সরে গেল চিত্তের তামসী যবনিকা আর সেই সঙ্গে নিখিল-জীবলীলার আনন্দময় প্রবাহ দেখা দিল অপরূপ হয়ে তরুণ কবির চক্ষে। সেইদিন থেকেই কবি এসে দাঁড়ালেন বিশ্বপ্রাণের উদার প্রাঙ্গণে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানবজীবন অভাবিত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে দেখা দেবার শুভ দিন এলো। স্বপ্নভঙ্গের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কবি যেন দুই চক্ষু মেলে নিখিল চরাচরের অখণ্ড সৌন্দর্য দেখলেন। মুগ্ধ হোল তাঁর কবিহৃদয়। তাই তো তিনি বলেছেন ঃ

'এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এই জন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থান হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।'

'বোলপুরের নির্জন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে' যে কবি-চিত্তের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যে, তারই সাত বছর পরে কৈশোরের কুঁড়ি উদ্ভিন্ন করে ধীরে ধীরে কেমন করে শতাব্দীর পটে নবজগতের ছবি নবীন রবির অভ্যুদয় ঘটল, কেমন করে তাঁর প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে—এইবার আমরা সেই কাহিনীর যবনিকা তুলে ধরব।

'সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র, তেরশত সন।' বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হোল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বত্রিশ বছর।

সেদিনের স্মৃতি কবির মনে আজীবন উজ্জ্বল ছিল। সেই—

'গভীর বসন্ত-নিশি গভীর গগন,
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন।
... ...
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।'

হ্যাঁ, কবিই তো—সত্য মন্ত্রদ্রষ্টা কবি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙালীকে তিনিই দিয়ে গেছেন অমরমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। আর তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি—কিশোর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক মহাকবির প্রতিভা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করে বলেছিলেন—এ বিধাতার সৃষ্টি, ব্যর্থ হবার নয়। সেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হোল বাংলা ১৩০০ সনের ২৬শে চৈত্র বিকেল বেলায়। চন্দ্র অস্ত গেল, সূর্য উঠল। বাংলার সাহিত্য-গগন এই নবরবির কিরণচ্ছটায় আলোকিত ছিল পরবর্তী পঞ্চাশ বছর। এই পঞ্চাশ বছর বাংলার সাহিত্যাকাশে, বাঙালীর চিত্তলোকে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একেশ্বর সূর্য।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যের উদয়াচলে আমরা দুইটি প্রতিভার অভ্যুদয় লক্ষ্য করেছি। প্রথম মাইকেল মধুসূদন, দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। দুজনেই ছিলেন দৈবী প্রতিভার অধিকারী। এঁদের সম্বন্ধে কবি লিখেছেন: 'সাহিত্যের কোনো একটি প্রাণবান্ রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন।'

মধুসূদনের সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই মহাকবির আবির্ভাবে

পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি চিরাচরিত ছন্দের যুগ শেষ হয়। পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে বিদ্রোহী কবি মধুসূদন নিয়ে এলেন বাংলা ছন্দে এক বিস্ময়কর প্রবহমানতা। যুগের প্রয়োজনেই এই নূতন ছন্দের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেনঃ 'অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হোল আধুনিক কাব্য 'রাজবহুন্নতধ্বনি'—কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলা দেশে অধিক সময় তো লাগে নি।...নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্বোধিত হোল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা ভাষার পাশে চলার পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলেন না।' বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম যুগান্তর দেখা দিল মধুসূদনের এই নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আশ্রয় করে। এই নব সঙ্গীতময় ছন্দই পঞ্চান্ন বছর পরে তার সার্থক পরিণতি লাভ করলো রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম একই বছরের ঘটনা। মধুসূদনের মৃত্যুর বিশ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে বাংলা গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ। তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করেন। কথা-সাহিত্যের নূতন রূপপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের একটি উন্নত আলোকস্তম্ভ। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মতনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব (১৮৬৫) কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তরের বার্তা বহন করে এনেছিল। সেইদিন থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিম-যুগ এবং রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কোলেই লালিত-পালিত। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু তাঁর কল্পনার ইন্দ্রজালে তাঁর দেশবাসীকে অভিভূত বা মুগ্ধ করেন নি, দেশের যে-জীবনধারা, তার ভেতরকার মনোহারিত্বেরও অনেকখানি সন্ধান তিনি তাদের দিয়েছিলেন। তাঁর উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' কেবল ভাবসর্বস্ব, কল্পনাবিলাসীর উচ্ছ্বাসোক্তি নয়; তিনি সাধারণ জীবনের

নিগূঢ় মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সমগ্র দেশের মধ্যে মাতৃমূর্তির বিরাট সাংকেতিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিম তাই একাধারে ঔপন্যাসিক ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষি। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়—তাঁর সঙ্গে তরুণ কবি বহু সাময়িক পত্রের আসরে বহু কথা-কাটাকাটি করেছেন, 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিমের অনেক প্রবন্ধের তিনি প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছেন। অন্যদিকে, কবির জবানবন্দীতে আমরা পাই—'বঙ্কিমবাবু সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।' কতবার কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কত রচনা তাঁকে শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে বাল্মীকিপ্রতিভা নাটক লেখেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সেই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন বাল্মীকি। এমন কি যে বছর বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান সেই বছরে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। 'মানসসুন্দরী'র কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র দেখে গিয়েছিলেন এবং সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় কবি বলেছিলেন: 'আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি লোকহিতৈষী কোনো মহান্ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটি সামাজিক কর্তব্য।' বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কবির গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আর একটি উক্তিতে—'সাহিত্য সাধনায় বঙ্কিম্ শুধু স্রষ্টাই ছিলেন না, নিয়ন্তাও ছিলেন।'

বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথম আলোক বিকীর্ণ হলো মধুসূদনের প্রতিভায়, তারপর বঙ্কিমপ্রতিভার স্নিগ্ধ কিরণে ভরে গেল বঙ্গবাণীর সোনার দেউল। সেই আলোকের ধারাকে ভগীরথের মতন প্রবহমান করে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। শতবর্ষের সেই আলোকধারা বাঙালীর চিত্তলোক করে দিয়েছে উদ্ভাসিত চিরকালের মতন।

চার

'স্বদেশী' রবীন্দ্রনাথের কথাই আগে বলি।

স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর সকল কবিত্বের উৎস। বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বমানবের পূজারী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সকলের আগে তিনি ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক—এ না উপলব্ধি করতে পারলে রবির আলোর ছোঁয়া কতটুকুই বা আমাদের মনে লাগবে? ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে যাই—মন ফিরে যায় সেই রেণেসাঁসের স্বুবর্ণ যুগে। সেই স্বুবর্ণ যুগের সোনার ফসল রবীন্দ্রনাথ—সেই যুগেই যে তাঁর জন্ম।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তখন থেকেই জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করলো। উনিশ শতকের সূচনাকালেই এক নতুন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হোল শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ আর সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে। সে-যুগের সাহিত্যে প্রথম ধ্বনিত হলো সেই নবলব্ধ মর্মবেদনা কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে। তার তূর্যধ্বনি প্রতিধ্বনিত হোল যুগশ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে। সেই একই সময়ে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা শুনলাম অত্যাচারির বিরুদ্ধে তীব্র-কণ্ঠের প্রবল প্রতিবাদ। এই যুগসন্ধিক্ষণেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর শৈশবেই 'হিন্দুমেলা'র সৃষ্টি। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এই হিন্দু-মেলার স্থান খুব উঁচুতে, এ-কথাটা যেন আমরা সব সময় মনে রাখি। কাজেই এর বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবেই বলা দরকার।

হিন্দুমেলার জন্ম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছ বছর। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (যাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ') ক্ষত তখনো শুকোয় নি। বিপ্লবী বাঙালীর

মনের ভিতরকার সেই বেদনারই প্রকাশ এই হিন্দুমেলা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটা মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার সর্বকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সেই প্রথম হয়।' হিন্দুমেলার পূর্বপুরুষ রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা।' গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মনোমোহন বসু ও শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির নাম হিন্দুমেলার প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই হিন্দুমেলাই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন করেছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মেলার যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তাতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি গাওয়া হয়:

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

সর্বভারতের এই প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন: 'এই মহাগীতি ভারতের সর্বত্র গীত হউক। বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।' তখন থেকেই বাঙালী শুধু বাংলার কথা ভাবে না—সে ভাবে সমগ্র ভারতের কথা। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবের ভাবুক। রঙ্গলালের 'নবীন ভাবুক' তিনিই।

বাঙালী সেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতে শিখল।

ভারতীয় মহাজাতি গঠনের সাধ জাগে বাঙালীর মনে।

স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের আয়োজনে মেতে উঠল বাঙালী।

হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি—দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়।

তত্ত্ববোধিনীই সর্বপ্রথম দেশের লোকের মনে উদ্দীপিত করে তোলে দেশানুরাগ। দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা রাজনারায়ণের কল্পনার সঙ্গে মিশে নবগোপালের উৎসাহ-উদ্যমের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে হিন্দুমেলা। বাঙালীর মনের দুইতট দিয়ে খরস্রোতে বয়ে গেল স্বদেশীভাবের প্রবাহ। সেই প্রবাহে শৈশবেই অভিসিঞ্চিত হোল রবীন্দ্রনাথের চেতনা।

হিন্দুমেলার আরেকটা ফলশ্রুতি—জাতীয় সঙ্গীতের অভ্যুদয়। গণেন্দ্রনাথ রচনা করলেন—'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন—'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।' দেখতে দেখতে স্বদেশপ্রেমের কবিতার জোয়ার বয়ে গেল দেশের মধ্যে। তারপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত হোল হেমচন্দ্রের চিত্তোন্মত্তকারী 'ভারত সঙ্গীত'। বাংলা দেশে দেখা দিল চাঞ্চল্য। লোকের মুখে মুখে ফিরল সেই অতুলন সঙ্গীত—

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াগ থেকে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাইলেন :

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
... ...
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

সুরে সুর মিলিয়ে মনোমোহন বসু গাইলেন :

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।

এমনিভাবে এইসব রচনার মধ্যে শোনা গেল দেশমুক্তি কামনার সুর।

সে সুর হয়তো ছিল ভোরের পাখির কাকলির মতো—সাহিত্য ও রসের বিচারে সে সুরে হয়তো পূর্ণতা ছিল না। তবু, স্বীকার করতেই হবে, তাতেই মন তখন তৈরি হয়ে উঠল। সেই পূর্ণতা দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত। দেশজননীর ধ্যান করলেন কমলাকান্ত এই বলে—'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি·········আমি সেই কালস্রোতের মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুমেলার ভাবধারা অনুপ্রাণিত করেছিল। অগ্রজদের সঙ্গে তিনি মেলায় যেতেন। কবির বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন তিনি হিন্দুমেলায় 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি পাঠ করেন। দু'বছর পরে মেলায় তিনি আর একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। সেই তাঁর প্রথম জাতীয় গান :

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।

সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। হিন্দুমেলার প্রসঙ্গে 'স্বাদেশিক সভা'র নামও উল্লেখ করতে হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি এই সভার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।' স্বদেশী রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবন আরম্ভ হয়েছিল এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই। বাংলার আকাশে-বাতাসে তখন ঘোষিত হয়েছে জাতীয়ভাব আর স্বদেশপ্রেমের আগমনী। কিশোর কবির জীবনে তারই মধ্যে মুকুলিত হয়ে ওঠে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ।

রবীন্দ্রনাথ যখন নবীন যুবক তখন বাংলা দেশে চলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। তিনিই ছিলেন তখন একটি নবযুগের স্রষ্টা—নবীন বাঙালী জাতির পথ প্রদর্শক। বঙ্কিমের চিন্তাধারা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুললো সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে ও ধর্মে। জাতির সামনে খুলে গেল নূতন দ্বার।

বঙ্গদর্শনের ভেতর দিয়ে বঙ্কিম বাঙালীর মর্ম দর্শন করলেন—প্রজ্জ্বলিত করলেন স্বদেশযজ্ঞের হোমানল। তাঁর আনন্দমঠের সন্তানদের কণ্ঠে আমরা শুনলাম জননী জন্মভূমিই আমাদের মা—আমাদের অন্য মা নাই। তাঁরই সেবাতে আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। জাতীয় আন্দোলনের মূলে তাঁর দানও কম নয়। তখনকার দিনের বহু ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যযুবক তাঁরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, আনন্দমোহন আর শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সকলের হৃদয়ে এইসময়ে জ্বেলে দেয় স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ অগ্নি। দেখতে দেখতে সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবউদ্বোধিত এই স্বদেশপ্রেমের সূতিকাগারেই স্বদেশী রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তিনি তাঁর পূর্বগামী সাহিত্যিকদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন আত্মশক্তির সাধনার ধারা। বঙ্কিমের যোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন তিনিই। তাই না সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গলায় নিজের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এই রবি, এ বিধাতার সৃষ্টি, ব্যর্থ হবার নয়।

বঙ্কিমের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হয় নি। তাঁর যৌবনকালেই কবি দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমের পর রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ছাড়া এমন উদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত বাংলা ভাষায় আর রচিত হয় নি। স্বাদেশিকতায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছেই হয়েছিল—তাঁরই সাহচর্যে ও দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথের মনে শৈশবেই জাতীয়ভাবের সঞ্চার হয়েছিল। যে বছর বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান, সেই বছর চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে তাঁর যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাতে তিনি বলেন: 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আর্কষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন নাই। আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ

গৌরব।......ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।' এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বছর পরে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 'বন্দেমাতরম্' নিজে সুরসংযোগ করে গান করেন। সেই থেকেই জাতীয় সংগীত হিসেবে জাতির চিত্তে বন্দেমাতরম্-এর প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে কলকাতায় কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল, তাতে যোগদান করে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচিত 'আমরা মিলিয়াছি আজ মায়ের ডাকে' এই গানটি করেন। ১৮৯৭-তে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে কবি গাইলেন 'সোনার বাংলা' গানটি। এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ছিলেন নাটোর কনফারেন্সের সভাপতি —তিনি বাংলাতেই বক্তৃতা করেছিলেন।

১৮৯৮। রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার হলেন। সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন প্রবন্ধ। প্রবন্ধ লিখেই কবি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন না। তিলকের মোকদ্দমার খরচ চালাবার জন্য অর্থসংগ্রহও করলেন। রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কলকাতার টাউনহলে একটা বিরাট সভা হোল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ—কবির বহু বিখ্যাত রচনার মধ্যে এটি একটি। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি বললেন, 'একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল। আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ি-ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে! একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গিয়াছে! আমরা এতই ভয়ঙ্কর।' এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের ধিক্কার দিয়ে স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন: 'রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনির সুরে 'কিছু দাও কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল

থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।'

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হোল। বঙ্কিমের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপ নিলো।

১৯০১।

নব পর্যায়ে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হোল। এবার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। সেই 'নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্ফুটনোম্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পনোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণগৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও চাদর। চরণে কোমল পাদুকা।'

এই রবীন্দ্রনাথ এখন 'নৈবেদ্য'র কবি, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। 'নৈবেদ্য' কাব্যে ঈশ্বর ও দেশ সম্বন্ধে যে সব ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এখন বঙ্গদর্শনে তাই তিনি গদ্যে প্রকাশ করলেন। 'নৈবেদ্য'র কথা আরো বলি। বিংশ শতকের সূচনাকালেই (১৯০১) কবি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করেন। আত্মনিবেদন 'নৈবেদ্য'র মর্মকথা। কবি লিখলেন:

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।

জীবনের মহৎকর্তব্যের পথে মুক্তি সাধনায় এবার অগ্রসর হবার প্রেরণা পেলেন কবি। অন্তরে অনুভব করলেন এক বৃহৎ কর্মোদ্যম। দেশের সুপ্ত শুভবুদ্ধি তখন জাগ্রত হয়েছে। নিরাসক্ত ভাবজীবনকে তিনি এইবার

দূরে সরিয়ে রেখে জীবনসাধনাকে মহৎকর্মে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন। নৈবেদ্যের পরিণত রূপ বিশ্বভারতী যার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায়। আর একটা কথা। নৈবেদ্য কাব্যের মধ্যেই আমরা পাই গীতাঞ্জলির পূর্বাভাষ। দেশ তখন পরাধীন। দেশের লোক পরপ্রত্যাশালুব্ধ। দেশের সেই মূঢ়তা ও দুর্গতি দেখে কবি নির্দেশ দিলেন—যেখানে মনুষ্যত্ব অবমানিত, সেখানে দেবতার আরাধনা নিষ্ফল। দেশের পক্ষে সেদিন এই নির্দেশের বড়ো প্রয়োজন ছিল।

জাতীয় জীবনের যতকিছু আবর্জনা আর যান্ত্রিকতা—তার উচ্ছেদ-সাধন করে তাকে পরিপূর্ণ, স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত করতে চাইলেন কবি। বিদেশীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্বে তিনি স্বদেশী সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের শৈবালকে দূর করতে চাইলেন। কবি উপলব্ধি করলেন—চারদিকে বাধা নিষেধের জঞ্জাল, বিশ্বদেবতার মূর্তি খণ্ড-বিখণ্ড, নানা বিভেদে দেশ বিচ্ছিন্ন, জীর্ণ। মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত—এক কথায়, আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন যেন ক্ষীণ ও ক্ষুন্ন। কবি দৃষ্টি ফেরালেন পরিপূর্ণ মানবতার দিকে। ভারতবর্ষের জন্য সৃষ্টি করলেন এক অপরূপ স্বর্গলোক। বললেন ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি ;

আর সেই সঙ্গে বিশ্বদেবতার উদ্দেশে তিনি প্রার্থনা জানালেন ঃ

নিত্য যেথা
তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করে পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

কবি দেখলেন বাঙালী বাক্‌পটু ও কর্মকুণ্ঠ। বাঙালী আত্মবিস্মৃত। দুর্বল আত্মপ্রকাশে সে কর্মবিমুখ। এই নির্জীব কর্মবিমুখ জাতিকে কবি

জাগ্রত করতে চেষ্টা করলেন। দিলেন তিনি আমাদের এক অভয়মন্ত্র ঃ 'আগে চল্, আগে চল্ ভাই।' জীবনসংগ্রামে সবাই অগ্রসর, ভারত শুধুই পিছনে পড়ে রয়েছে। ব্যথার সুরে তাঁর হৃদয়বীণার তন্ত্রে অমনি ঝঙ্কার উঠল ঃ

দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?

আর কবির বিশ্বদেবতা জাতিকে শোনালেন ঃ

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

এই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ মূর্তি প্রকাশ পেল স্বদেশীযুগের অরুণালোকিত ঊষায়। এইবার আমরা সেই কাহিনী বলব।

১৯০৫-এর বাংলা। বাংলা দু-টুকরো হোল সরকারী আদেশে। বাঙালীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোল। হাজারকণ্ঠে ওঠে প্রতিবাদ। ৭ই আগস্ট টাউন হলের সেই স্মরণীয় সভায় জন্ম নিল স্বদেশী আর বয়কট। বাঙালীর চেতনায় শুরু হয় এক মহা আলোড়ন—এক অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য। তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হোল মাতৃপূজার মন্ত্র—বন্দেমাতরম্। ঊষার নবারুণ আলোকে সেই মন্ত্র হয়ে উঠল প্রাণময়। সখারামের 'দেশের কথা'র ভেতর দিয়ে বাঙালীর কানে এলো আর একটা নূতন মন্ত্র—স্বরাজ। ঠিক এমনি দিনে আশ্বাসের বাণী নিয়ে জাতির সামনে এসে দাঁড়ালেন জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ। এই উদ্বেলিত বিক্ষোভের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমন পরিষ্কার নির্দেশ আর কেউ দিতে পারেন নি। সভাটা হয়েছিল ১৯০৪-এর ২২শে জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে। সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। কবি বললেন—গ্রামের দিকে ফিরে তাকাও, সেখানেই দেশের প্রাণশক্তি। রাজদ্বারে আবেদন করে

ক্ষোভপ্রকাশ করলে কিছু হবে না। আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাসী দেশের নেতাদের তিনি সর্বপ্রথম বললেন—ভারতের মর্মস্থল তার গ্রাম। গ্রামের সমস্যাই ভারতের সমস্যা। গ্রামে নূতন প্রাণ আনতে পারলেই ভারতের কল্যাণ।

তারপর কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল জাগরণের এক নূতন মাঙ্গলিক। একতাবদ্ধ হবার এক অভিনব প্রেরণা, এক নূতন উৎসাহ দিয়ে কবি লিখলেন—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

দেশব্যাপী এই বিক্ষোভের দিনেই কবি লিখলেন: 'দেবতা হউন আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত-চাবুক জেল-জরিমানা পিউনিটিভ-পুলিশ ও গোরাগুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।' বাংলার এই স্মরণীয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দ্বি-খণ্ডিত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নর-নারীকে ঐক্যের মন্ত্রে, মিলনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর দেশবাসীকে যে-ঐতিহাসিক বাণী উপহার দিয়েছিলেন, তা কোনদিনই ভুলবার নয়। কবি বলেছিলেন:

'উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর—যে-রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে-পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে-মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া

বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও।'

বাংলাদেশের অগ্নিসাধকেরা সেদিন নিজেদের অস্থিপঞ্জর জ্বালিয়ে যে অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের জন্য সেদিন মশাল রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভীরু স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে তিনিই সেদিন বলেছিলেন ঃ

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন,
ওরে উদাসীন।

আরো বলেছিলেন ঃ

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

পাঁচ

কিন্তু স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শুধু এই নয়।

সেদিন বাংলার ভাব ও চিন্তা জগতের নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন এমন সভা হয় নি যাতে কবি প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা না করেছেন। প্রত্যেক সভাতেই ভিড় হোত অসম্ভব। ভাব-বিপ্লবের বীজ থাকতো তাঁর সেইসব প্রবন্ধ ও বক্তৃতায়। এই সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেশের যুবকদের চিত্তে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম উল্লেখ করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' এঁরা দুজন ছিলেন শক্তিমান লেখক। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন মূর্তিমান অগ্নিশিখা—তাঁরও দেহমন স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। তাঁর সন্ন্যাস-ব্রত দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের নামান্তর ছিল। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ছিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—দেশের চারদিকে তিনিও স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। ১৩০৮ সনে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই বিদ্যালয়ের ভার তিনি দিয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের ওপর। যা ছিল আগে 'বোর্ডিং' স্কুল, তাকে যথার্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপদান করেন তিনিই। তবে তিনি এখানে বেশিদিন ছিলেন না। দেশ তখন তাঁকে দাবী করছে, তাই স্বদেশীযুগের আলোড়নের মধ্যে তিনিও এসে পড়লেন। যে-আত্মশক্তির সাধনা কবির মূলমন্ত্র ছিল—ব্রহ্মবান্ধবও ছিলেন তারই উত্তরসাধক। তিনিও ঘৃণা করতেন ভিক্ষার রাজনীতিকে। 'সন্ধ্যা'য় তাই তিনি প্রচার করতেন বিপ্লবের বাণী।

স্বদেশীযুগের উষায় বাংলার চিন্তা ও ভাবজগতে বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বও স্মরণীয়। কবি ও সন্ন্যাসীর মতো তিনিও প্রবন্ধ লিখে ও

বক্তৃতা করে তরুণদের চিত্তে এনে দিয়েছিলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ভাষার ঐশ্বর্যে ও ভাবের সম্পদে সেদিন বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' যুবকদের মনের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি। এই স্বদেশীযুগের উষায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন্ সোসাইটি' ও 'ডন্' পত্রিকার নামও স্মরণীয়। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ সোসাইটির অফিসে এসে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে স্বদেশসেবার নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই ডন্ সোসাইটির এক সভায় কবি তাঁর সেই প্রসিদ্ধ গানটি—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে'—সর্বপ্রথম গেয়েছিলেন। এইখানেই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। তেমনি সাবিত্রী লাইব্রেরিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে দু-একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সময়ের আর একটি ঘটনা—'শিবাজী উৎসব'। সে বছরের (১৯০৪) কলকাতায় এটি ছিল একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। পুণা থেকে তিলক এলেন এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য। জাতীয় জীবনে তখন একটা নূতন শক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছিল, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই জিনিসই বাইরে রূপ নিলো এই উৎসবের মধ্যে—আর তাকেই ভাষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায়। টাউন হলের বিরাট সভায় দীর্ঘ সমুন্নত দেহ কান্তিমান কবি যখন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন:

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি।
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজী—

তখন সভায় শ্রোতাদের মনে যে শিহরণ খেলে গিয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই স্বদেশীযুগের উষাতেই কবি লিখলেন 'কথা ও কাহিনী'। বাঙালীর সামনে জেগে উঠল প্রাচীন ভারত—

বাঙালী তরুণদের চিত্তে জেগে উঠল মারাঠী, রাজপুত ও শিখের গৌরবময় স্মৃতি। তরুণদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

একদিকে কবি যেমন বাংলার তরুণদের চিত্তে স্বদেশের বীর্য ও গৌরব-কাহিনী জাগিয়ে তুলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনাও করতেন। তার সাক্ষ্য মিলবে এই সময়কার 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়; কবি স্বয়ং এর সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসারের কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলতেন। রবীন্দ্রনাথ তাই একাধারে ভাবুক ও কর্মী।

তারপর এলো স্বদেশীযুগ। সে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছাস। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখীবন্ধনের দিনে আমরা রবীন্দ্রনাথের আর এক মূর্তি দেখলাম। সেদিন ছিল ১৩ই অক্টোবর, ১৯০৫। ঐদিনই কার্জনী দম্ভ বাস্তবরূপ নিল—বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হোল। রাখীবন্ধন তারই স্মরণচিহ্ন। এ উৎসবের পরিকল্পনা ছিল মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথের। বিশেষ করে এই উৎসবের জন্যই তিনি লিখেছিলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি। এই গান গেয়েই একে অন্যের হাতে সেদিন রাঙা রাখী বেঁধে দিয়েছিল আর বলেছিল:

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব অনুভূতি। সেদিনের সকালবেলায় কবি নিজে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে রাখীবন্ধন উৎসব করেছিলেন।

মোট কথা, স্বদেশী আন্দোলনে কবির দান নানাদিক দিয়ে অসামান্য।

সভাসমিতিতে বক্তৃতা—

সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ,

কবিতা, গল্প ও গান—এবং জাতীয় শিক্ষা প্রচার—

এই সবের ভেতর দিয়ে রবির আলো স্বদেশীযুগের আকাশকে সেদিন যেভাবে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল, তা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বদেশীযুগে তিনি যেসব গান রচনা করেছিলেন—তার প্রত্যেকটি ছিল গভীর দেশপ্রেম ও অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ। সেদিনের বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে ও জনসভায় লোকে তাঁরই গান গাইত। মাতৃভূমির চিন্ময়ী রূপকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করে কবি লিখলেন ঃ

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী ॥

তারপর দেশজননীর মূর্তিকে বিশ্বজননীর মূর্তির মধ্যে বিলীন করে দিয়ে কবি গাইলেন ঃ

ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।

ভাঙা বাংলার সেই রক্ত-রাঙা দিনে জাতির চিত্তে উঠেছিল প্রলয়ের ঝড়। কবি যেন প্রত্যক্ষ করলেন সেই ঝড়ের ভেতর থেকে বঙ্গমাতার এক নতুন আবির্ভাব। তাই তো তিনি লিখলেন ঃ

ও গো মা,
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে
রৌদ্র-বসনী।

কবি শুধু জ্যোতির্ময়ী কল্যাণময়ী মায়েরই ধ্যান করে ক্ষান্ত হলেন না, নদী-মাঠ-আমবন-ঘেরা পল্লী বাংলাকেও প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর কণ্ঠে উঠল দীপক ঝঙ্কার ঃ

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

সেই সঙ্গে বললেন ঃ

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এদেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালোবেসে ॥

এর পর প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছেড়ে গঠনমূলক স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন কবি। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতার মধ্যেই এর ইঙ্গিত ছিল। ফিরে এলেন তিনি তাঁর শিলাইদহের নিভৃত পল্লীভবনে। পল্লীসংগঠন কাজে নামলেন এইবার তিনি। গ্রামসেবা-ব্রতের আদর্শ তুলে ধরলেন তরুণদের সামনে। হাতেকলমে কাজ শুরু করলেন শ্রীনিকেতনে। দশে মিলি করি কাজ—শুধু এইটুকু বলেই নিশ্চেষ্ট থাকার মানুষ ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। কাজের মধ্যেই তিনি নামলেন এইবার। যুবকদের উৎসাহিত করলেন গঠনমূলক কাজে। দেশহিত বা দেশসেবার অর্থ যে পল্লীসমাজের মধ্যে এসে বাস করে তাদের একজন হয়ে গিয়ে তাদের সুখদুঃখের ভাগী হওয়া—এই আদর্শ কতকাল আগে কবি আমাদের দিয়ে গেছেন। কবির গ্রামসেবার উদ্যোগ-আয়োজনের ইতিহাস জানবার মতন। এইসময়ে (১৯০৭) 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'দেশের যুবকদের প্রতি আমার একটি মাত্র পরামর্শ আছে। সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা

বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিও না।...যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও, মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎ-সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে।...তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।'

এই সময়েই 'গোরা'-র আবির্ভাব।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিল এই 'গোরা'।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এ এক নূতনতর দান।

এর বিস্তীর্ণ পটে কবি উদ্‌ঘাটিত করলেন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের আর ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের চিত্রশালা। ভারতবর্ষের ইতিহাসটা কী? না—এর একদিকে রয়েছে সংস্কৃতির উদার মহত্ত্ব, সার্বভৌম কারুণ্য আর সকলের ওপর শান্ত নিষ্ঠা—তবু দেখা যায় যে সামাজিক বৈষম্য, আচার-বিচারের নিগড়, জাতিভেদের জঞ্জাল আর জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও মূঢ়তা দেশকে তিলে তিলে নিয়ে চলেছে বিনাশের পথে। রবীন্দ্রমনীষা উপলব্ধি করল এই সত্যকে নিবিড়ভাবে। কবিচিত্তের সেই বিরাট অনুভূতিসাগর মন্থন করে আবির্ভূত হোল এই 'গোরা'—তাঁর বহু সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম। 'গোরা' আধুনিক ভারতের মহাভারত। বলতে গেলে এই-ই রবীন্দ্রনাথের গদ্য মহাকাব্য। মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে যে শক্তি, তেজ ও প্রতিভা থাকা দরকার, গোরার চরিত্রে তা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। রবীন্দ্র-কল্পনার সার্থক-সৃষ্টি গোরা সকল দিক দিয়েই যেন একটি বিরাট মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে কামনা করবে তাকে হতে হবে এমনি একজন বিরাট মানুষ যার মধ্যে থাকবে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা আর অনুভূতির গভীরতা। আত্ম-সম্মানবোধ এই বৃহদায়তন উপন্যাসের নায়কের হৃদয়ের প্রধান প্রকৃতি—

উনিশ শতকের বাঙালী তরুণকে কবি এই মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেদিন।

যে প্রদীপ্ত ভাস্বর মূর্তিতে কবি স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন, সেই মূর্তি কোনোদিন ম্লান হয় নি—তাঁর অন্তরের দেশপ্রেম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক সুরে বাঁধা ছিল। এরই মধ্যে পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই। গঠনমূলক স্বদেশসেবায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনাগুলি আজো তার মূল্য হারায় নি। ১৯০৮। পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই রাষ্ট্র সম্মেলনে সভাপতি বাংলায় বক্তৃতা করলেন। সেইদিন থেকে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা ভাষা মর্যাদার আসন পেল। এই অভিভাষণেই আমরা পেলাম তাঁর গঠনমূলক স্বদেশ সেবার আদর্শ। বললেনঃ 'অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহাতে একত্র মিলিয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিলেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা বলিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।'

দেশের যুবকদের ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। উত্তেজনা নয়, বিরোধ নয়, কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃত তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।' এ-আহ্বান আজো তার মূল্য হারায় নি। গঠনমূলক কর্মসাধনা ভিন্ন যে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণতা লাভ করে না, আন্দোলনের সঙ্গে গঠনের আদর্শ না থাকলে পরে জোয়ারের জল কমে গেলে যে অবস্থা হয়, তেমনি

উত্তেজনা দূর হোলে নিঃসম্বল হয়ে পড়তে হয়। কবির দূরদৃষ্টিতে এই সত্যটি সকলের আগে ধরা পড়েছিল। সেদিন তিনি বার বার বলেছেন, গ্রামকে কেন্দ্র করে গঠনমূলক কাজ ভিন্ন, স্বাধীনতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কবির এই চিন্তারই পরিণত রূপ শ্রীনিকেতন। 'স্বদেশী সমাজে' তিনি যে আদর্শ ব্যক্ত করেছিলেন, পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে পল্লীসংগঠনের যে কথা বলেছিলেন—এই শ্রীনিকেতনে কবি তারই একটা বাস্তব পরীক্ষা করলেন।

কবি ইংলণ্ডের গ্রাম, ইংলণ্ডের চাষীদের অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন তাদের অবস্থার সঙ্গে, বাংলার কোনো তুলনা হয় না। অন্তরে বেদনা অনুভব করেছেন। সেই বেদনা রূপ নিলো ধীরে ধীরে শ্রীনিকেতনে। কবি রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে তাঁর সুরুলের কিছু জমি আট হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। সেইখানেই গড়ে ওঠে শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন কবির জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। তাঁর এই গ্রামসংস্কার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অদ্ভুতকর্মা ইংরেজ যুবকের স্মৃতি। তাঁর নাম লেনার্ড এলম্‌হারস্ট্। তিনিই সুরুলের শ্রীনিকেতনে গ্রামসংস্কারের কাজ শুরু করেন। মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশে এই শ্রীনিকেতনেই গ্রামোদ্যোগের জন্ম হয় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে।

স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আরেক মূর্তি আমরা দেখেছি।

১৯০৬-এর এপ্রিলে বরিশালে পুলিশের লাঠিতে প্রথম রক্তপাত হয় এদেশে। কবি স্বয়ং সে-ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। সে-বছর বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের পাশাপাশি প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন আহূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার সভাপতি। এই সাহিত্য সম্মেলনের কল্পনা তাঁরই ছিল। তিনিই সেদিন, সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ 'পার্টিসন'-এর দিনে বলেছিলেন—ইংরেজ বাংলাকে ভেঙে দু'টুকরো করেছে বলেই সজ্ঞানে সযত্নে বাঙালীর চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য

অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। বরিশাল সেদিন ছিল বয়কট আন্দোলনের পীঠস্থান। নেতা ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। সেই বরিশালে প্রথম রক্তপাতের তের বছর পরে এলো জালিনওয়ালাবাগ। সেও ছিল নববর্ষের দিন। ১৯১৯, ১৩ই এপ্রিল। মাইকেল ও'ডায়ার তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। পাঞ্জাবকে কংগ্রেস আন্দোলনের পীঠভূমি হতে দিতে তিনি নারাজ। সে-বছর পাঞ্জাবে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবার কথা। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হোল। জনগণ হোল বিক্ষুব্ধ। উত্তেজনার কেন্দ্র ছিল অমৃতসর। শহরের ভার দেওয়া হোল সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। সভা-সমিতি সব নিষিদ্ধ। ১৩ই এপ্রিল। বিশ হাজার লোকের এক সভা আহুত হোল জালিনওয়ালাবাগে। বাগের তিনদিকই ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা। জেনারেল ডায়ার কোনরকম সতর্ক করে না দিয়েই গুলী চালাল সেই নিরস্ত্র এবং নিরীহ জনতার ওপর। হাজার হাজার লোক হোল হতাহত। সঙ্গে সঙ্গে জারী হোল সামরিক আইন। সংবাদপত্রে পাঞ্জাবের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হোল। লোকজনের ওপর চললো অকথ্য অত্যাচার। এক নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল পরাধীন ভারতবর্ষে। তারপর দেড়মাস বাদে যেদিন লৌহকবাট ভেদ করে এই হত্যাকাণ্ডের খবর রাষ্ট্র হোল সারা দেশে, তখন সারা ভারতে দেখা দিল বিক্ষোভ। কিন্তু প্রতিবাদ করার পথ বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ শুনে শুধু মর্মাহতই হলেন না, রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলেন। কল্পনার চক্ষে তিনি যেন দেখতে পেলেন বর্বরতার উলঙ্গ মূর্তি। বন্দুকধারী সেনা বেপরোয়া গুলী চালায় নিরস্ত্র এবং নিরুপদ্রব জনতার ওপর। দেড় হাজার মানুষের শবদেহ পড়ে আছে জালিনওয়ালাবাগে। পৈশাচিক জুলুম তার নগ্ন মূর্তি নিয়ে নৃত্য করে বেড়ায় পঞ্চনদের নানা স্থানে। রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে কত রাজপথ। কত রাজপথে সাপের মতো গর্জে ওঠে মিলিটারী সৈন্যের হাতের চাবুক হাত-পা বাঁধা লোকদের পিঠের ওপর—শরীরের চামড়া মাংস কেটে

যায় সেই তীক্ষ্ণ আঘাতে। কত নারীর সর্বস্ব হয় লুণ্ঠিত। কত না পথচারীকে অতিক্রম করতে হয় রাজপথ বুকে হেঁটে আর কত পথের পাশেই ওঠে ফাঁসীর মঞ্চ। কিন্তু কল্পনা নয়—এ সবই ঘটেছিল, পরে জানা গেল। কবি তাই অস্থির হয়ে উঠলেন। আকাশে বাতাসে যেন ভেসে এলো পাঞ্জাবের হাহাকার শান্তিনিকেতনে। মর্মাহত কবি তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। তিনি এর প্রতিবাদ করবেন। চলে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন এক বিখ্যাত দেশনেতার সঙ্গে। বললেন, 'একটা প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করো, আমি তাতে বক্তৃতা করব।' কিন্তু কেউ রাজী হয় না। ভারতশাসন আইনের নাগপাশে কণ্ঠরুদ্ধ। সারা দেশ যেন ভয়ে মুহ্যমান। তারপর?

রবীন্দ্রনাথ তখন স্যর রবীন্দ্রনাথ। চেমসফোর্ড তখন বড়লাট। ৩০শে মে-র প্রভাতী সংবাদপত্রে সকলে দেখল পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে কবি 'নাইটহুড্' (স্যর উপাধি) বর্জন করে বড়লাটকে একখানা খোলা চিঠি লিখেছেন। চিঠি তো নয়—যেন আগ্নেয়গিরি-স্রাবের দুর্বার ধারা। দেশের সেই দুর্দিনে 'সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়' সারা দেশকে তিনি দিলেন অভী-মন্ত্র। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি তাঁর জীবনের এক পরম গৌরবকাহিনী—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পরাধীনতার বেদনা আর অপমান দেশের হয়ে কবি কতখানি অনুভব করেছিলেন, তা এই চিঠির প্রতিটি শব্দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু উপাধি বর্জন করেই কবি তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন না—বিলেতে গিয়ে ইংরেজের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক চিঠি যেন 'জ্যোতির্ময় আলোকরশ্মির তরবারি-লেখা—সেদিন বাংলার কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোল ধিক্কার—দেশের পুঞ্জীভূত অপমানের বিষ নীলকণ্ঠের মতো আপন কণ্ঠে ধারণ করে, তিনি ইংরেজের হাতে-পরানো মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

ধুলোয়—তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর পাশে।'
লিখলেন বড়লাট চেমসফোর্ডকে : 'যখন জানিলাম, যে আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল ; যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে ; অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব।…আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। …অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই নাইট-পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।'

পাঞ্জাবের দুঃখের তাপে কবির বুকের পাঁজর কতখানি পুড়েয়েছিল, তা আজ যখন আমরা মনে করি, তখন এই কথা আমরা না ভেবে পারি না যে—সেদিন, সেই আতঙ্কিত দুদিনে--পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের মাঝখানে যে এক কৃষ্ণ-যবনিকা নেমে এসেছিল—সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারেব বুক চিরে রবির আলো যেভাবে দেখা দিয়েছিল—তার মধ্যেই আমরা পাই 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' রবীন্দ্রনাথকে। দেশের লোক সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আবার সেই মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম উনিশ বছর পরে। হিজলী হত্যাকাণ্ডের দুঃখ, অপমান ও বেদনা থেকে আবার নির্গত হয় অগ্নিস্রাব। কবির কণ্ঠে ইংরেজের দণ্ডধরদের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে আবার গর্জে ওঠে প্রতিবাদ :

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে।

এইবার বলি সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী। কবি সেদিন বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ। বাংলার জেলে জেলে তখন চলেছে রাজবন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। সেই অত্যাচার চরমে উঠলো মেদিনীপুরের হিজলী বন্দিশালায়। এখানে বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীরা থাকতেন। ১৯৩১, ১৬ই সেপ্টেম্বরের রাতে বর্বর কারারক্ষীরা অসহায় রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালায় বিনা কারণে। নিহত হলেন রাজবন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত আর সন্তোষ মিত্র। আহতদের সংখ্যাও ছিল কুড়ি। দুদিন পর্যন্ত বন্দিশালার বাইরে এ-খবর কেউ জানতে পারে নি। তারপর কোনো এক পথ দিয়ে খবরটা এলো কলকাতায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। লোকে জানল কী নৃশংস অনাচার ঘটে গেছে হিজলীর নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত সেই বন্দিশালায়। দেশময় দেখা দিল প্রবল বিক্ষোভ। সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ছুটে গেলেন হিজলীতে। তাঁরা নিয়ে এলেন এই দুই বীর শহীদের মৃতদেহ। গুলিচালনার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভার আয়োজন হোল। অনুরোধ গেল কবির কাছে সেই সভায় পৌরোহিত্য করবার জন্য। কবি সে-আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না। সংবাদ শুনে অবধি তিনি বিচলিত ছিলেন। জাতির অন্তরের বেদনাকে তিনি ছাড়া আর রূপ দেবেই বা কে? ২৬শে অক্টোবর সভার তারিখ ছিল। কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ল টাউন হলে সেদিন। ছাব্বিশ বছর আগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে এই টাউন হলেই হয়েছিল এমনি জনসমাবেশ। আজকের জনসমাগম যেন আরো বেশি। এক লাখের ওপর লোক জমায়েত হয়েছিল। টাউন হলে সভা করা সম্ভব হোল না। ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে সভা হোল। অসুস্থ শরীর নিয়েই সভায় এলেন জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ জাতির মর্মবেদনাকে ভাষা দেবার জন্য। সেদিন তাঁর কণ্ঠস্বরে কী তীব্র আবেগ, উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে কী জ্বালা—তেমন আবেগময় বক্তৃতা কবি বহুদিন করেন নি। কবি

যেন সমগ্র বাঙালী জাতির ক্ষোভ ও মর্মবেদনাকে ব্যক্ত করলেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষার ভেতর দিয়ে।

অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কবি সেদিন বলেছিলেনঃ 'আমি আমার স্বদেশবাসীদের হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রম-শালী হোক্ না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়—ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায় প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হোতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি?'

তাই তো মর্মাহত কবি অশ্রুজলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

প্রসঙ্গত আর একটা ঘটনার উল্লেখ করি। দুর্গম ভুটান-সীমান্তে বক্সা দুর্গ তখন বন্দীশিবিরে পরিণত হয়েছে। বাংলার বহু রাজবন্দী সেখানে আটক ছিলেন। একবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলেন তাঁরা। জেল থেকেই পাঠালেন কবিকে অভিনন্দন। সে-অভিনন্দন কবির হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি রাজবন্দীদের লিখে পাঠালেনঃ

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয়।

১৯৩২, জানুয়ারি। মহাত্মা গান্ধী বিলেত থেকে ফিরছেন। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ফিরতে হোল হতাশ হয়ে খালি হাতে। দেশে ফেরার সাতদিনের মধ্যেই বড়লাট তাঁকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। পুণার যারবেদা জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হোল তাঁকে। সেদিনও দেখা গেল কবি

নীরব রইলেন না, একটি বিবৃতিতে জানালেন প্রতিবাদ। বিলেতে প্রধান মন্ত্রীকে তারযোগে জানিয়ে দিলেন। তাতে বললেন—'এর পর ইংরেজ রাজপুরুষেরা আর কী করে ভারতীয়দের কাছ থেকে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা আশা করতে পারেন?'

এই যারবেদা জেলেই গান্ধীজির সেই ঐতিহাসিক অনশন আরম্ভ হয়। উপলক্ষ হরিজন। মনে হয় যারবেদা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিভৃত চিন্তার কালে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কবির আহ্বান:

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

সেই সময়ে (১৯৩২) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন হিন্দুরা অখণ্ড জাতি নয়, বর্ণহিন্দুরা তপশীলীদের থেকে পৃথক। আগে ভারত ছিল এক, মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনী-অধিকার সাব্যস্ত হওয়াতে হোলো দুটো, আর এই নূতন প্রস্তাবের মধ্যে দুইকে ভেঙে তিন করার অভিসন্ধি প্রকাশ পেল। কতকাল থেকে ভারতবর্ষ ঐক্যের সাধনা করে আসছে, রাজনীতিতে ভারতবর্ষের এই ঐক্যমুখী সমাজকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করতে পারলে শাসকশ্রেণীরই সুবিধা। গান্ধীজি জেল থেকে আপত্তি জানালেন। আরম্ভ করলেন আমৃত্যু অনশন। গান্ধীজির এই অনশন সংবাদে যারপরনাই বিচলিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। যারবেদা জেলে তার করে জানালেন, 'ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য অমূল্য জীবন দান করা সার্থক কাজ।' গুরুদেবের কাছ থেকে এই আশীর্বাদই আশা করেছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু সত্যই যদি অনশনে গান্ধীজির মৃত্যু হয়, রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন, তা হোলে জাতির এই সঙ্কটক্ষণে সমূহ বিপদ। কার সঙ্গে আলোচনা করবেন? নেতারা সবাই তখন কারান্তরালে। কবি অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি পুণা রওনা হলেন। পরে খবর এলো ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীজির প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কবির সামনেই গান্ধীজি

তাঁর অনশনব্রত ভঙ্গ করেন। সেদিন মহাত্মাজির অনুরোধে কবি গেয়েছিলেন ঃ

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো ॥
কর্ম যখন প্রবল-আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো ॥

১৯৩৭। আন্দামানে বাংলার রাজবন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হন। তখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন হোল। জাতির প্রতিনিধি তিনি—তিনি ছাড়া জাতির সে-মর্মবেদনাকে ভাষা দেবে কে, কে-ই বা করবে প্রতিবাদ? কবিকে সেই জনসভায় সভাপতিত্ব করতে হোল। দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীরা তখন অনশন শুরু করে দিয়েছেন। কবি জানালেন সহানুভূতি, সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ও আচরণের করলেন প্রতিবাদ। তারপর স্বয়ং তিনি আন্দামান রাজবন্দীদের কাছে টেলিগ্রাম করে জানালেন ঃ দেশ তোমাদের পিছনে আছে।

আহ্বান এলো সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে; মহাজাতিসদনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। কবি নিজের হাতে এই মহাজাতিসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সময়েই তিনি সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করে লিখলেন ঃ 'আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।…কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি। আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সকল দেশকে।'

বাংলার তরুণদের চিত্তে কবি একদা ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছিলেন। সেই বিপ্লবীদের তিনি কী চক্ষে দেখতেন তার প্রকাশ আছে কবির এই কথাগুলির মধ্যে : 'দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল।...তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।' জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসির মঞ্চে যে নির্ভীক তরুণের দল তাদের জীবনকে পুষ্পাঞ্জলির মতো দেশজননীর পায়ে উৎসর্গ করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে গিয়েছেন কবি বার বার তাঁদের জানিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ– সেই দুর্গম পথের দুঃসাহসিক যাত্রীদের যাত্রার পথকে তিনিই তো নির্ভয় করে দিয়েছিলেন তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়।

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। রবি তখন অস্তাচলগামী। তবু শেষবারের মতো আমরা দেখলাম রবীন্দ্রমানসের উদ্ভাসন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপ দেখলেন কবি। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ওপর কবি তাঁর আস্থা হারালেন। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ব্যবহার দেখে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে এ কী বৈশ্য মনোবৃত্তি! ইংরেজের ওপর তাঁর আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার-শোধিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎস একেবারে শুকিয়ে গেল। স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গভীর উদ্বেগ অনুভব করলেন কবি। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে স্বদেশ, স্বজাতি ও বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করে দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ বাণী—'সভ্যতার সংকট'। তাতে তিনি লিখলেন : 'পাশ্চাত্ত্যজাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি।...ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।...আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম

আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।... আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে, বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বকালের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।'

এমনি করেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগের উষাকাল থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিন পর্যন্ত, জাতির মর্মভেদী বেদনাকে, তার পরাধীনতার জ্বালাকে, ভাষা দিয়েছেন—আশার বাণী শুনিয়েছেন বার বার। ইতিহাসের পটে তিনি দেখেছেন যুগান্তের ছবি—অস্তাচলগামী রবি যেন মুখ ফিরিয়ে দেখেছেন আগামী দিনের নবসূর্যোদয়কে। এমনি করেই স্বদেশলক্ষ্মীর বেদীমূলে রবির আলো দান করে গিয়েছে তার উজ্জ্বল দীপ্তি। কালের পটে সে-দীপ্তি অম্লান। জাতির চিত্তলোকে কবির আসন তাই অক্ষয়। যখনই আমরা সেই স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব তখনই তাঁর উদ্দেশে আমরা বলব ঃ

তোমার আসন শূন্য আজি, পূর্ণ করো হে।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র।

কবি ও বৈজ্ঞানিক।

এই দুজনের জীবনসাধনার মিলিত ইতিহাস বাঙালীর চিরকালের গৌরবের সম্পদ। এঁদের দুজনের জীবনব্যাপী সৌহার্দ্যের কাহিনী বড়ো সুন্দর। বিংশ শতকের আরম্ভে বাংলার মানসলোক রবির উজ্জ্বল প্রভায় যেমন উদ্ভাসিত হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল এই বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার আলোকে। কবি যেন ভারতের ভাবী গৌরব দেখেছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে, তাই তো এই প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের প্রতি প্রথম থেকেই তিনি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। সরকারী উপেক্ষা আর তাঁর স্বদেশবাসীর অনাদরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু জগদীশচন্দ্রের কাজ সহজ করে দেন নি, বিশ্বের সমক্ষে এনে তাঁর প্রতিভাকে তিনি লোকখ্যাত করেছেন। সেই নিবিড় বন্ধুত্বের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়।

১৮৯৭। প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বিলেত গেলেন। উদ্দেশ্য—তাঁর গবেষণার ফল প্রচার করা আর সেইসঙ্গে সেখানকার বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত হওয়া। এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের মনীষার পরিচয় পেয়ে য়ুরোপের বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হলেন—লর্ড কেলভিনের মতো বিজ্ঞানীবৃদ্ধ জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা দেখে সকলেই বিস্মিত। পরাধীন দেশে এত বড়ো প্রতিভা। লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন—সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন। সাগর-তরঙ্গে ভেসে এলো বাংলা দেশে এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের সাফল্যের সংবাদ। সেই খবর শুনলেন রবীন্দ্রনাথ। তখনো জগদীশচন্দ্রের

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। গৌরব বোধ করলেন তিনি বাঙালী বৈজ্ঞানিকের এই কৃতিত্বে। অন্তরের আবেগ-আনন্দকে ভাষায় তিনি রূপ দিলেন এইভাবে ঃ

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনাহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

জয়মাল্য নিয়ে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর জীবনের সেই পরম লগ্নে তাঁর সাধনার বন্ধুর পথে এসে দাঁড়ালেন সুহৃদ্ রবীন্দ্রনাথ। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল এক নিবিড় বন্ধুত্ব। বিজ্ঞানী ও কবির সেই অপূর্ব বন্ধুত্ব শুধু দুটি মহৎ জীবনের পারস্পরিক প্রেরণার পুণ্য কাহিনী নয়, বাংলার জাতীয় জীবনসাধনার একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ও বটে। এমন বন্ধুত্ব আধুনিককালে দুর্লভ। একজনের জ্ঞানের আলোকচ্ছটা, অন্যজনের অসামান্য প্রতিভার দ্যুতি—শতাব্দীর পটে এই দুটি আলোকরেখা দেখা দিল সমান্তরাল রেখায়। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের এই দিগ্বিজয়ের কাহিনী আধুনিক ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে যে কত বড়ো একটা যুগান্তর নিয়ে এলো, তা সেদিন মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তো সেদিন তাঁরই কণ্ঠ আশ্রয় করে বঙ্গমাতা তাঁর অশ্রুসিক্ত আশীর্বাদ বৈজ্ঞানিককে পাঠিয়েছিলেন ঃ

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

তারপর থেকেই শুরু হয় ছুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। রবীন্দ্রনাথ তখন ছত্রিশ পার হয়েছেন। আর জগদীশচন্দ্র উনচল্লিশে পদার্পণ করেছেন।

এই বন্ধুত্বের সূচনার কাহিনীটি বড়ো সুন্দর।

জগদীশচন্দ্র বিলেত থেকে প্রথমবার ফিরলে পরে কবি একদিন এলেন তাঁকে অভিনন্দিত করতে। জগদীশচন্দ্র তখন বাড়ি ছিলেন না। তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখলেন সাধারণ একখানি ঘর। চেয়ার ও টুলের ওপর যন্ত্রপাতি এদিক-ওদিক ছড়ানো; মেঝেতে টেস্ট টিউব আর রাশি রাশি কাগজ। কাগজে শুধু গ্রাফ আঁকা। ভাবলেন তিনি—এরই মধ্যে বসে কাজ করেন বৈজ্ঞানিক! ফিরে এলেন তিনি জগদীশচন্দ্রের টেবিলের ওপর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গাঁদাফুলের একটি তোড়া রেখে। তাঁর অন্তরের এই অকপট নিদর্শনের সঙ্গে একটুকরো কাগজে মুক্তোর মতো অক্ষরে লিখে রেখে এলেন: 'বন্ধুর প্রীতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' এই ঘটনার ছু-একদিন পরেই ছুজনের মধ্যে আলাপ হয়। প্রথম পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'এমন সময় জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার ওপর ওঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তিসূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। প্রবল সুখত্বঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল, সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।'

এই বন্ধুত্বের আরো একটি কারণ ছিল। কবি এই বিজ্ঞানীর মধ্যে আলো দেখেছিলেন। দেখেছিলেন ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি। জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভার দীপ্তি, বিজ্ঞানসাধনা-গর্বী প্রতীচ্য সমাজের বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও বিজয়-গৌরব রবীন্দ্রনাথকে এক নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিজ্ঞানী

জগদীশচন্দ্রের সাধনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে—এই বিশ্বাসই কবিকে বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রে সেদিন বেঁধেছিল। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বকে জগদীশচন্দ্র দেবতার করুণা বলে মনে করতেন। তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুর ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় শ্রদ্ধা দৃষ্টি রেখে বার বার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—জয়লাভের পূর্বেই তিনি জগদীশচন্দ্রের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন। এমন বন্ধুত্ব পৃথিবাতে বিরল।

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়ে ঘোষণা করলেন—'জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে। কোনো ভুল নেই, জড়ও চৈতন্যময়। প্রাণ সর্বত্র—এমন কি ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তার নাগাল পাবই। পাথরেও যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করবই! সর্ববস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে আমি জানি।'—তখন এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বন্ধুর আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনিই প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন—'জড় কী সজীব?' বঙ্গদর্শনে বেরুল সেই প্রবন্ধ। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সুদূর ঐতিহ্যের ধারা দেখতে পেয়েছিলেন। লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতার উপসংহারে জগদীশ-চন্দ্র যা বলেছিলেন তা-ই পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম। ভারতবর্ষে যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি'—জগদীশের আবিষ্কারের মধ্যে আমি যেন সেই সত্যকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম।' ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল; তিনি যেন অতি সহজেই তাঁর ঔপনিষদিক শিক্ষা ও কবি-দৃষ্টি দিয়ে জগদীশ-চন্দ্রের সত্যটিকে অন্তরে গ্রহণ করে নিলেন। পদ্মার তীরে শিলাইদহের

নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন পৃথিবীর সর্বত্র চেতনার প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন তাঁর লোকোত্তর কল্পনায়, প্রায় সেই একই সময়ে কলকাতায় তাঁর গবেষাণাগারে জগদীশচন্দ্র এই সত্যটিকে সপ্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র—এই দুজনের মধ্যে চেতনার সাদৃশ্যই দুজনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রে বেঁধেছিল।

জগদীশচন্দ্রের জীবনেতিহাসে আমরা পড়েছি যে সহস্র রকমের অসুবিধার মধ্যে তাঁকে বিজ্ঞানের সাধনা করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বন্ধুর জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রও তেমনি দ্বিতীয়বার য়ুরোপে এসে নিজের কাজ ছাড়া আরো একটা বড়ো কাজ করেছিলেন। কি করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপের সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরবেন, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। এক চিঠিতে তিনি কবিকে লিখলেন ঃ 'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, তাহা আমি হইতে দিব না। তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। তুমি সার্বভৌমিক। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই।' এই সময়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটি অনুবাদ করিয়ে লণ্ডনের একটি কাগজে প্রকাশ করেন। কবির নিজের কিন্তু তখন তাঁর রচনার ভাষান্তর বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তিনি তাঁর রচনা-লক্ষ্মীকে জগৎ সমক্ষে বের করতে তখনো কুণ্ঠিত ছিলেন। বলেছিলেন—'এ পারের পাখি কি ওপারে গিয়ে তেমনভাবে ডাকতে পারবে।'

১৯০১, ১০ই মে। লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। গ্যালারিতে বিপুল লোক সমাগম। তাঁর জীবনের অগ্নিপরীক্ষার চরম মুহূর্ত সেদিন। লেডি অবলা বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত আর ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। এদিকে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুর জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত রয়েছেন এবং প্রতিদিন সংবাদপত্রে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত প্রত্যেকটি সংবাদ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছেন। নিবেদিতার চিঠি এলো। সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন—বিদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্র তাঁর

প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত সত্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানজগতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বন্ধুর এই জয়সংবাদে উল্লসিত হলেন কবি। বঙ্গদর্শনে আবার প্রবন্ধ বেরুল –আচার্য জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা। বিদেশে যাতে বন্ধুর দিগ্বিজয়ের পথ সুগম হয়, দেশের মাটিতে বসে এই ছিল কবির সর্বক্ষণের চিন্তা ও চেষ্টা।

বিদেশে নূতন সাফল্যের ফলে একদিকে জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা যেমন উদ্যম, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি টাকার অভাবে দুর্ভাবনায় তিনি ছিলেন সর্বক্ষণ উৎপীড়িত। বিদেশে তাঁর বিজ্ঞানসাধনা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত হোক, এই ছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের মনের একান্ত অভিলাষ। এতদিন পরে এই তরুণ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের প্রতিভাকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষ, শিষ্যভাবে নয়, সমকক্ষ ভাবেও নয়, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেয়েছে, এই সুযোগ যাতে টাকার অভাবে, প্রেরণার অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়, সেজন্য এদেশে সেদিন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত। যেদিন বিলেত থেকে জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্ধুকে লিখলেন : 'একদিকে আমার কাজের জন্য অসীম পরিশ্রম ও অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিতেছে না।' তখন রবীন্দ্রনাথ এই বিজ্ঞানীর মধ্যে একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হলেন।

জগদীশচন্দ্রের ছুটি ফুরিয়ে এলো, পুঁজিও নিঃশেষিত ; কিন্তু তখনো পর্যন্ত কাজ শেষ হয় নি। অনেক সাধ্যসাধনার পর ভারতসচিব অর্ধেক বেতনে আরো কিছুদিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করলেন। বিলেত থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত তখন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন : 'জগদীশচন্দ্র যে কঠিন ব্রত আরম্ভ করেছেন, তাকে সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তিতে নিয়ে যেতে দীর্ঘ দিনের সাধনা প্রয়োজন। আমাদের কর্তব্য তাঁকে সাহায্য করা।' এইটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। ঠিক

সেইসময়ে জগদীশচন্দ্রও কবিকে এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর অবস্থা জানিয়ে লিখলেন: 'বন্ধু, নানা কারণে আমার মন ম্রিয়মান। ছুটি বৃদ্ধি হোল না; ফার্লোর জন্য দরখাস্ত করেছি। তাও পাই কি না সন্দেহ। এমন অবস্থায় কাজ ফেলে গেলে যে আবার সূত্র ধরতে পারব, সে আশা হয় না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেসব আলোকরেখা দেখছি, তা একবার মুছে গেলে আর কখনো পাবো না।' এ যেন সেই সুদূর সাগরপার থেকে মাইকেলের আবেদন মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের কাছে।

বন্ধুকৃত্য করতে সচেষ্ট হলেন রবীন্দ্রনাথ।

টাকার অভাবে জগদীশচন্দ্রের সাধনা যাতে ব্যাহত না হয়, তাঁর মহাব্রত অর্ধপথে অসমাপ্ত রেখেই যাতে তিনি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য না হন, সেজন্য কবি ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিলেন। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে তিনি লিখলেন: 'তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।' আর একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়ে লিখলেন: 'তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারও মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে, নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।'

বন্ধুর গবেষণা-কাজ বিলাতে যাতে বাধাহীনভাবে চলতে পারে তার জন্য কী উদ্বেগ রবীন্দ্রনাথের। এইখানেই তো কবির মহত্ব। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই তো আমরা অনুভব করি রবির আলোর অনির্বচনীয় মহিমা। কবি বুঝলেন, বিলাতে নিশ্চিন্তমনে গবেষণা কাজ চালানোর জন্য বন্ধুর অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থের পরিমাণ কয়েক শত হলে চলবে না, কয়েক সহস্র হওয়া দরকার।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদেশে বন্ধুর এই দুর্দিনে তাঁদের কথাই কবির সর্বপ্রথম মনে পড়ল। ত্রিপুরার ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখলেন : 'আমি ধনীর পুত্র কিন্তু ধনী নহি। অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সংকল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই—সুতরাং শুভকর্মের অন্তরায় স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে বিসর্জন দেওয়াই আমার কর্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত, ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য।' তারপর তিনি ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের দ্বারস্থ হলেন। মহারাজকে কবি লিখলেন : 'আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারো দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না ; আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজিত করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক। সেইগুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।'

মহারাজা কবিকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ আগর-তলায় এলেন। মহারাজা তাঁর হাতে বিজ্ঞানীর জন্য দশহাজার টাকা তুলে দিলেন। সেই টাকা রবীন্দ্রনাথ তখনই প্রবাসী বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন আর এই টাকা পেয়েই জগদীশচন্দ্র নিরুদ্বেগে বিলাতে কাজ করতে থাকেন। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুকৃত্যের ইতিহাস স্মরণ করি তখন আমাদের মন তাঁর মহত্ত্বের বেদীমূলে শ্রদ্ধাবনত না হোয়ে পারে না। বন্ধুর গৌরবের পথ সুগম করে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ প্রয়াস চিরদিন

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। গদ্যে পদ্যে জগদীশচন্দ্রের মহিমা পঞ্চমুখে প্রচার করেও যেন রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতেন না। বন্ধুর জয়বার্তা ঘোষণা করে তিনি যেন ক্লান্তি বোধ করতেন না। এর কারণ—প্রতিভা যেমন প্রতিভাকে চিনতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে কবি প্রথম থেকেই একরকম নিঃসংশয় ছিলেন। তাই না তিনি একসময়ে লিখেছিলেন: 'আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম।' তাঁর 'কথা' কাব্যখানি বন্ধুকে উৎসর্গ করে কবি লিখলেন:

সত্যরত্ন তুমি দিলে,—পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কেবল উৎসাহ-বাণী পাঠিয়েই বা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক রূপে স্বয়ং বন্ধুর বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালী পাঠকসমাজে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেদিন। কবির কলমে বৈজ্ঞানিক সত্য কত সুন্দররূপে ফুটে উঠত তা পাঠ করে জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। দূর সিন্ধুপারে, পাশ্চাত্যদেশে জগদীশচন্দ্র নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করবেন, তাঁর সাধনায় ভারতবর্ষ আবার গুরুর বেদীতে আরোহণ করবে, এই চিন্তা-ভাবনা এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। তাই সহস্রকর্মের মধ্যে থেকে বন্ধুর জয়বার্তা ঘোষণায় কবির উৎসাহের সীমা ছিল না।

এক চিঠিতে কবি লিখছেন জগদীশচন্দ্রকে:

'ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়-

শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্যসমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।'

বিজ্ঞানকর্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। সেদিন তাঁর সম্বর্ধনার জন্য তাঁর দেশবাসী যে আয়োজন করেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন মিশিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ

জয় তব হোক জয়।
অবারিত গতি তব জয়রথ
বিতরে যেন আজি সকল জগৎ।

জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন, তখন কবি পদ্মার তীরে শিলাইদহে। এখানে তাঁদের একটা জমিদারি কাছাবি ছিল। নাম তার কুঠিবাড়ি। নীলকর সাহেবরা একসময়ে এটা তৈরি করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কুঠিবাড়ি কিনেছিলেন। পদ্মার তীরে এই ভবনটি কবির বড়ো প্রিয় ছিল। পদ্মার সেই নির্জন তীর থেকেই তিনি বন্ধুকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। জগদীশচন্দ্র সে-নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন সমাদরে। পদ্মার সেই নির্জন তীরে কবি ও কবি-জায়ার স্নিগ্ধ আতিথেয়তা তাঁর পক্ষে খুবই লোভনীয় ছিল। শিলাইদহে কবি প্রতিদিন একটি করে সুন্দর গল্প রচনা করে প্রতিসন্ধ্যায় সেই গল্প বন্ধুকে পড়ে শোনাতেন। পদ্মার তীরে মনোরম কুঠিবাড়ি। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। জগদীশ-চন্দ্র মুগ্ধ হলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত হলেন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কাবুলিওয়ালা', 'জয়-পরাজয়', প্রভৃতি সদ্যরচিত গল্প-গুলি শুনে। এই গল্পগুলি বিজ্ঞানীর কল্পনাকে সেদিন বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন সহৃদয় ও সমঝদার পাঠক ছিলেন।

জমিদারির কাজ শেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম এখানে আসেন। প্রথম প্রথম নদীর ঘাটে নৌকায় থাকতেন। জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। নূতন পরিবেশে নূতন রচনা লিখবার প্রেরণা পেলেন

সেইসময়ে জগদীশচন্দ্রও কবিকে এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর অবস্থা জানিয়ে লিখলেন: 'বন্ধু, নানা কারণে আমার মন ম্রিয়মান। ছুটি বৃদ্ধি হোল না; ফার্লোর জন্য দরখাস্ত করেছি। তাও পাই কি না সন্দেহ। এমন অবস্থায় কাজ ফেলে গেলে যে আবার সূত্র ধরতে পারব, সে আশা হয় না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেসব আলোকরেখা দেখছি, তা একবার মুছে গেলে আর কখনো পাবো না।' এ যেন সেই সুদূর সাগরপার থেকে মাইকেলের আবেদন মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের কাছে।

বন্ধুকৃত্য করতে সচেষ্ট হলেন রবীন্দ্রনাথ।

টাকার অভাবে জগদীশচন্দ্রের সাধনা যাতে ব্যাহত না হয়, তাঁর মহাব্রত অর্ধপথে অসমাপ্ত রেখেই যাতে তিনি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য না হন, সেজন্য কবি ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিলেন। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে তিনি লিখলেন: 'তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।' আর একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়ে লিখলেন: 'তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারও মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে, নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।'

বন্ধুর গবেষণা-কাজ বিলাতে যাতে বাধাহীনভাবে চলতে পারে তার জন্য কী উদ্বেগ রবীন্দ্রনাথের! এইখানেই তো কবির মহত্ব। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই তো আমরা অনুভব করি রবির আলোর অনির্বচনীয় মহিমা। কবি বুঝলেন, বিলাতে নিশ্চিন্তমনে গবেষণা কাজ চালানোর জন্য বন্ধুর অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থের পরিমাণ কয়েক শত হলে চলবে না, কয়েক সহস্র হওয়া দরকার।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদেশে বন্ধুর এই দুর্দিনে তাঁদের কথাই কবির সর্বপ্রথম মনে পড়ল। ত্রিপুরার ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখলেন: 'আমি ধনীর পুত্র কিন্তু ধনী নহি। অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সংকল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই—সুতরাং শুভকর্মের অন্তরায় স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে বিসর্জন দেওয়াই আমার কর্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত, ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য।' তারপর তিনি ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের দ্বারস্থ হলেন। মহারাজকে কবি লিখলেন: 'আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারো দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না; আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজিত করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক। সেইগুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।'

মহারাজা কবিকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় এলেন। মহারাজা তাঁর হাতে বিজ্ঞানীর জন্য দশহাজার টাকা তুলে দিলেন। সেই টাকা রবীন্দ্রনাথ তখনই প্রবাসী বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন আর এই টাকা পেয়েই জগদীশচন্দ্র নিরুদ্বেগে বিলাতে কাজ করতে থাকেন। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুকৃত্যের ইতিহাস স্মরণ করি তখন আমাদের মন তাঁর মহত্ত্বের বেদীমূলে শ্রদ্ধাবনত না হোয়ে পারে না। বন্ধুর গৌরবের পথ সুগম করে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ প্রয়াস চিরদিন

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। গদ্যে পদ্যে জগদীশচন্দ্রের মহিমা পঞ্চমুখে প্রচার করেও যেন রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতেন না। বন্ধুর জয়বার্তা ঘোষণা করে তিনি যেন ক্লান্তি বোধ করতেন না। এর কারণ—প্রতিভা যেমন প্রতিভাকে চিনতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে কবি প্রথম থেকেই একরকম নিঃসংশয় ছিলেন। তাই না তিনি একসময়ে লিখেছিলেন: 'আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম।' তাঁর 'কথা' কাব্যখানি বন্ধুকে উৎসর্গ করে কবি লিখলেন:

সত্যরত্ন তুমি দিলে,—পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কেবল উৎসাহ-বাণী পাঠিয়েই বা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক রূপে স্বয়ং বন্ধুর বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালী পাঠকসমাজে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেদিন। কবির কলমে বৈজ্ঞানিক সত্য কত সুন্দররূপে ফুটে উঠত তা পাঠ করে জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। দূর সিন্ধুপারে, পাশ্চাত্যদেশে জগদীশচন্দ্র নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করবেন, তাঁর সাধনায় ভারতবর্ষ আবার গুরুর বেদীতে আরোহণ করবে, এই চিন্তা-ভাবনা এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। তাই সহস্রকর্মের মধ্যে থেকে বন্ধুর জয়বার্তা ঘোষণায় কবির উৎসাহের সীমা ছিল না।

এক চিঠিতে কবি লিখছেন জগদীশচন্দ্রকে:

'ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়-

শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্যসমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।'

বিজ্ঞানকর্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। সেদিন তাঁর সম্বর্ধনার জন্য তাঁর দেশবাসী যে আয়োজন করেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন মিশিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ

জয় তব হোক জয়।
অবারিত গতি তব জয়রথ
বিতরে যেন আজি সকল জগৎ।

জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন, তখন কবি পদ্মার তীরে শিলাইদহে। এখানে তাঁদের একটা জমিদারি কাছারি ছিল। নাম তার কুঠিবাড়ি। নীলকর সাহেবরা একসময়ে এটা তৈরি করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কুঠিবাড়ি কিনেছিলেন। পদ্মার তীরে এই ভবনটি কবির বড়ো প্রিয় ছিল। পদ্মার সেই নির্জন তীর থেকেই তিনি বন্ধুকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। জগদীশচন্দ্র সে-নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন সমাদরে। পদ্মার সেই নির্জন তীরে কবি ও কবি-জায়ার স্নিগ্ধ আতিথেয়তা তাঁর পক্ষে খুবই লোভনীয় ছিল। শিলাইদহে কবি প্রতিদিন একটি করে সুন্দর গল্প রচনা করে প্রতিসন্ধ্যায় সেই গল্প বন্ধুকে পড়ে শোনাতেন। পদ্মার তীরে মনোরম কুঠিবাড়ি। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। জগদীশ-চন্দ্র মুগ্ধ হলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত হলেন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কাবুলিওয়ালা', 'জয়-পরাজয়', প্রভৃতি সদ্যরচিত গল্প-গুলি শুনে। এই গল্পগুলি বিজ্ঞানীর কল্পনাকে সেদিন বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন সহৃদয় ও সমঝদার পাঠক ছিলেন।

জমিদারির কাজ শেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম এখানে আসেন। প্রথম প্রথম নদীর ঘাটে নৌকায় থাকতেন। জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। নূতন পরিবেশে নূতন রচনা লিখবার প্রেরণা পেলেন

এইখানে। উত্তরবঙ্গের সাজাদপুরের নির্জন কুঠিতে বসে তিনি রচনা করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটক। 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক। এই নাটকের মূল সুর : 'কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।' শিলাইদহে এক ফাল্গুন মাসের ভরা বসন্তের দিনে কবি লিখলেন 'সোনার তরী'। তখন 'সাধনা' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখতে হোত। 'কিন্তু যত লেখাই লিখুন, কবিতা লিখতে পারলেই মনটা ভরে।'—তাই তো বলতেন—'একটা কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না।' এই শিলাইদহে কবি রচনা করেন 'মানস-সুন্দরী'---তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য কবি একটা ছোট স্কুল খুলেছিলেন। তখন কবি এখানে কিছুদিনের জন্য সংসার পেতেছিলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। কিন্তু কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর পক্ষে শিলাইদহ ছিল যেন নির্বাসনদণ্ড। এই সমাজশূন্য ভদ্রপরিবেশ-শূন্য গ্রামের মধ্যে তিনি কিছুতেই সুখী বোধ করতেন না যেন।

সেই শিলাইদহে এলেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ দিনের বেলায় গল্প লিখতেন; সন্ধ্যায় সেই সদ্যরচিত গল্প বন্ধুকে তিনি পাঠ করে শোনাতেন। সেইসব অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি বিমুগ্ধচিত্তে বৈজ্ঞানিক শুনতেন আর কল্পনার নেত্রে তিনি দেখতেন বিশ্বের সাহিত্যজগতে সেই-সব গল্প গৌরবের স্থান পেয়েছে। য়ুরোপে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিতার অনুবাদ কি করে প্রকাশ করা যায়, এই চিন্তা জগদীশ-চন্দ্র সব সময়ের জন্য করতেন এবং এ নিয়ে তিনি বার বার কবিকে বলতেন, অনুযোগ করতেন। পরে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বন্ধুর কবিখ্যাতি কেবলমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, সারা বিশ্বে তা

য়ে পড়ে—সমস্ত অন্তর দিয়ে জগদীশচন্দ্র তা কামনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে আজ বিশ্বকবি—তার মূলে ছিল তাঁর বন্ধুর কামনা ও প্রয়াস।

১৯১২। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার স্বয়ংকৃত অনুবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন য়ুরোপের দরবারে। জয় করলেন বিদেশীর চিত্ত 'গীতাঞ্জলি' দিয়ে। কবির বাণী জগৎকবিসভায় স্থায়ী আসন পেলো। পরের বছর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল' প্রাইজ পেলেন। কবির এই সম্মানলাভে উল্লসিত হয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁকে একখানি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন এইসময়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চির সহায় হউন।'

বিজ্ঞানী ও কবির সাধনাক্ষেত্র ছিল আলাদা। কিন্তু দুজনার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল আশ্চর্য রকমের। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—'আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে,' জগদীশচন্দ্রও তেমনি অকপটে বলেছেন: 'রবির বন্ধুত্বই আমার জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে, আমার সাধনাকে করিয়াছে জয়যুক্ত?' জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা যেমন রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ধরা দিয়েছিল, তেমনি জগদীশচন্দ্রও তাঁর বন্ধুর প্রতিভার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করেছিলেন সকলের আগে। দুজনের নিবিড় দেশপ্রীতির মধ্যেই ছিল দুজনের মিলনের অবকাশ।

সাত

'দিলো ডাক, পঁচিশে বৈশাখ.

কবির জীবনে একে একে উনপঞ্চাশটি বৈশাখ অতিক্রান্ত হোল, এবার তাঁর জীবনে এলো পঞ্চাশতম বৈশাখ—এলো তাঁর সেই বরণীয় জন্মতিথি। প্রতি বৎসর এই তিথিতে তিনি যেন পঁচিশে বৈশাখের ডাক শুনতে পান। কবির জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ১৯১২-তে। সেবার শান্তিনিকেতনে তাঁর স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকেরা মিলে তাঁকে দিলেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য। সেই উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে হোল আর একটি সংবর্ধনা সভা। প্রকাশ্যে কবিকে নিয়ে বাঙালীর এই প্রথম উৎসব। জীবনের পঞ্চাশটি বছর পূর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে কাব্য, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ভেতর দিয়ে এমন এক নূতনত্ব এনে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে যে তার প্রভাবে বিশ্বের দরবারে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কবির এমন রাজকীয় সংবর্ধনা এদেশে এই প্রথম। এমন আয়োজন আগে কেউ দেখে নি। দেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রথম স্বীকৃতি। বাংলার বিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এটা একটা মনে রাখবার মতো ঘটনা। এর আগে কোনো সাহিত্যিক দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান নি। সংবর্ধনার তারিখ ছিল ২৮শে জানুয়ারি। প্রকাণ্ড টাউনহলের কোনোখানে একটি তিল ধারণের স্থান ছিল না। সবই লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। টাউন হলের ইতিহাসে বহু স্মরণীয় সভার মধ্যে এই রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভা একটি। হলের বাইরে পর্যন্ত জনসমাবেশ হয়েছিল। সে-সভায় বাংলা দেশের যত মনীষী সবাই একত্রিত হয়েছিলেন। দেশের মধ্যে জ্ঞানে মানে অর্থে বিত্তায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ সবাই উপস্থিত সেই কবি সংবর্ধনা

সভায়। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। সমকালীন বাংলার বরেণ্যদের মধ্যে সবাই এসেছেন। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকেরাও বাদ যায় নি। যেন গোটা বাংলা দেশই সেদিন তার প্রিয় কবিকে সম্মান জানাতে উপস্থিত হোল টাউন হলে। এ রকম আগ্রহ আর কখনো দেখা যায় নি। সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তরুণদের মধ্যে। কবিকে সম্মান দেখাবার সুযোগ পেয়ে বাঙালীর আনন্দের যেন সীমাপরিসীমা ছিল না সেদিন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কবিকে প্রথমে রূপোর পাত্রে অর্ঘ্য দেওয়া হোল। তারপর একটা সোনার-সূতোর হার আর একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হোল তাঁর গলায়। সোনার থালায় করে উপহার দেওয়া হোল একটি দামী সোনার পদ্ম ও হাতীর দাঁতের ফলকে খোদাই করে লেখা সুন্দর এক অভিনন্দন—আর এই সবের সঙ্গে দেওয়া হোল সমস্ত বাঙালীর অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি আর সম্মান। কবিকে লক্ষ্য করে সমস্ত বাঙালীর হৃদয় থেকে সেদিন যেন এই কথাই উঠেছিল :—

জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি লইবে মানি
হে গুণী, তব প্রতিভা গুণে জগৎ-কবি সর্ব।

রবীন্দ্রপ্রতিভা সর্বতোমুখী।

কবি, গীতকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সুবক্তা, সুগায়ক—কি না তিনি।

আবার তিনি সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক এবং দেশহিতৈষী।

কতো বিচিত্র ভাবের সমাবেশ এই একটি মানুষের মধ্যে। এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনো মানুষের জীবনে কেউ কখনো এ জিনিস প্রত্যক্ষ করে নি। সত্যই তিনি বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

এইবার তাঁর প্রতিভা শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না—দিগ্‌বিদিকে তা ব্যাপ্ত হোল, বিকীর্ণ হোল রবির আলো সকল দেশে। এপারের বিহঙ্গ এবার এলো ওপারে।

১৯১২। মে মাস। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন। এবারের 'মিশন' য়ুরোপের চিত্তলোক জয় করা। লণ্ডনে তখন ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রমথলাল সেন। এবার তাঁর বিলাত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। কবির আগমনের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আছেন রোদেন্‌ষ্টাইন। এঁর সঙ্গে দু'বছর আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির প্রথম আলাপ। পরে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। রোদেনষ্টাইনই কবিকে লণ্ডনে আসবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। এবার কবির সঙ্গে ছিল তাঁর কয়েকটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন। লণ্ডনে পৌঁছে সেই অনুবাদ তিনি প্রথম দেখালেন রোদেনষ্টাইনকে। কবিতাগুলি পড়ে অপার আনন্দ পেলেন তিনি। কবিতা নয়, যেন মুক্তারাশি, ভাবলেন রোদেনষ্টাইন। সেই রত্নের সন্ধান দিলেন তিনি তখনকার য়ুরোপের কবিশ্রেষ্ঠ ইয়েটস্‌কে। ইয়েটস্ মুগ্ধ হলেন সেই তর্জমা-করা কবিতাগুলি পাঠ করে। তিনি ছুটে এলেন লণ্ডনে তাঁর নিভৃত পল্লীনিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য।

ইয়েটস্ আর রবীন্দ্রনাথ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই কবির মিলন সেদিনকার লণ্ডনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সূচনা করলো এক নূতন অধ্যায়ের। ভারত ও ইংলণ্ডের মিলনের বীজ সেইদিনই রোপিত হোল সেইখানে। সেদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি ইয়েটস হয়ে উঠলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্। তারপর 'অল্প কয়দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষীগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হোল।' সকলেই প্রাচ্যের এই নবোদিত সূর্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন, তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে তাঁরা পেলেন

নূতন সুর, নূতন চিন্তা। শেক্‌সপিয়র, মিলটন ও শেলির দেশে সে-কবিতা ছিল সম্পূর্ণ নূতন। এক সংবর্ধনা সভায় ইয়েটস্ ঘোষণা করলেন: 'আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে, আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা ও সম্মান করবার ভার পেয়েছি। তাঁর রচিত প্রায় একশোটি গীতি কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমার সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমসাময়িক আর-কোনো ব্যক্তির এমন কোনো ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানিনে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।' ইয়েটস্ স্বয়ং ছিলেন সেই সভার সভাপতি।

ইংরেজিতে বেরুল 'গীতাঞ্জলি'—ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে।

'Song Offerings' এই নামে প্রকাশিত কাব্যখানির ভূমিকা লিখলেন ইয়েটস।

তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়ে তখন এসেছিলেন য়ুরোপে, তাই তো য়ুরোপের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি'। শুধু গান নয়—কবির গভীর আধ্যাত্মিক আকুতি। বহুসমস্যাপীড়িত য়ুরোপের ব্যক্তিজীবনে গীতাঞ্জলি মনে হয়েছিল যেন একটি স্নিগ্ধ আলোকের উদ্ভাসন।

ইংলণ্ডের বিদগ্ধ মহলে তাই অতি সহজেই সমাদর লাভ করল রবীন্দ্রনাথের সেই বই।

কাগজে কাগজে গীতাঞ্জলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—এই সুন্দর নামটি সকলের মুখে মুখে।

সত্যই সেদিন এই নামের তরঙ্গ উঠেছিল ইংলণ্ডে।

গীতাঞ্জলির গান মাতিয়ে তুললো সেখানকার সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীদের।

বিপুল সম্মান লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশে কবির সম্মান এই প্রথম।

কী পেয়েছিল য়ুরোপ সেদিন এই ক্ষুদ্র কাব্যবস্তুটির মধ্যে?

পেয়েছিল বিশ্বব্যাপী মহামিলনের গান :

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

এইখানে একটু গীতাঞ্জলির মর্মকথা বলব।

নৈবেদ্য, শিশু, উৎসর্গ ও খেয়া-র পর রবীন্দ্রমানসে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব। গীতাঞ্জলি বিরহের কাব্য। কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। এর সব কবিতাই আধ্যাত্মিক। এই কাব্যেই মনে হোল কবি যেন সত্যের চির রহস্যময় দ্বারে এসে উঁকি মারছেন। কবি এখানে মিস্‌টিক্—কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। আলোছায়ার মিশ্রণ গীতাঞ্জলিতে ততটা নেই যতটা আছে সন্ধানের তীব্রতা, অনুভূতির গাঢ়তা আর প্রকাশের পর্যাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পরিপূর্ণতা আমরা যেন এই কাব্যে বেশি করে পাই। এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ। তাইতো তত্ত্ব-দৃষ্টির এত প্রখরতা গীতাঞ্জলির গানে। জীবনসাধনার যে মর্মকথাটি এই কাব্যে অভিব্যক্ত, তার মধ্যে আছে দেশের পূর্বতন অধ্যাত্মচিন্তার অনুগতি। 'জীবনের সহজ-অনুভূতির মধ্যেই যে পরম উপলব্ধির ঝলক ঝলে তাহা বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-সুফী-মরমিয়া সাধনার সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই তত্ত্বের অপরূপ মীমাংসা।'

গীতাঞ্জলিতে কবির প্রার্থনা :

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।

আকাশের নক্ষত্রলোকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছেন কবি, দেখেছেন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা, প্রত্যক্ষ করেছেন মানব-সংসারের দুঃখসুখ এবং এরই মধ্যে নিজের অন্তরে, অন্তরতমের বিরহ বোধ করেছেন তিনি :

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।

জড়বাদী এবং ক্ষমতাগর্বী য়ুরোপ যখন গীতাঞ্জলিতে পাঠ করল ঃ

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

তখন তাদের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। ভারতের কবির কাছে য়ুরোপের কবিরা নতি স্বীকার করলো। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ জগৎ-কবিসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেলেন। য়ুরোপ দিল তাঁর মাথায় সোনার মুকুট। সাহিত্যের জন্য তিনি পেলেন নোবেল প্রাইজ। প্রাচ্যের মধ্যে তিনিই প্রথম এই দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। তাঁর এই গৌরবলাভে সমস্ত বাঙালীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর মুখ সেদিন উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা ভাষাকে জগতের সাহিত্যসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন রবীন্দ্রনাথ, এ কি বাঙালীর কম গৌরব!

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' পেলেন।
সমস্ত দেশ কবির এই সম্মানে গৌরব বোধ করল।
ভারতবাসী আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।
রবির আলো এবার বিকীর্ণ হোল বিশ্বভুবনে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কলকাতার জ্ঞানী-গুণী সবাই মিলে তখন চললেন সেই রবিতীর্থে। তাঁরা এলেন কবিকে সংবর্ধনা করতে। স্পেশাল ট্রেনে করে বোলপুরে এসে পৌঁছলেন প্রায় পাঁচশো লোক। এই স্মরণীয় ঘটনার তারিখ ছিল ২৩শে নভেম্বর, ১৯১৩। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে উৎসব হোল। নানা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায় মানপত্র দিলেন কবিকে। কিন্তু এই আনন্দ, এই গৌরবপ্রকাশ উচ্ছ্বাসের মধ্যেই মিলিয়ে গেল না—এর পাঁচ মাস পরেই প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বেরুল 'সবুজপত্র'। এই সবুজপত্রকে আশ্রয় করেই 'নূতন কালের প্রেরণায়, নবীনের আকর্ষণে,

সাহিত্যে আবার নূতন কথা বলবার জন্য কবির মন আর একবার জেগে উঠল।' সবুজের দলকে আহ্বান করে কবি লিখলেন :

আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

১৯১৪। জুলাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল য়ুরোপে। কবি মনে দারুণ আঘাত পেলেন। যুদ্ধের কারণ কোথায়, তাই তিনি সন্ধান করলেন নিজের মনের মধ্যে। অস্ত্রে অস্ত্রে এই হিংসার উন্মাদ রাগিণী তাঁর কাব্য-বিতানের শান্তি ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। তবু কবি বললেন, 'মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক— সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হয়।'

এইবার বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের কথা।

বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রায় জীবনের শেষ বয়স অবধি। শুধু ভ্রমণ করেন নি, সেই সঙ্গে বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন তিনি।

সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি পৃথিবীর পথে নেমেছেন এবং তিনটি মহাদেশের মধ্যে এমন শহর নেই যেখানে তিনি যান নি। নানা পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এইসব ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনী কবির শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনার নিদর্শন বললেই হয়। এ যেন তাঁর কবিমানসেরই অভিজ্ঞান। এরই মধ্যে ফুটে উঠেছে নানাচারী কল্পনার আধিপত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর তাঁর কেন্দ্রনিষ্ঠ মননের গাঢ়তা। তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনাসর্বস্ব নয়, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ; এর মধ্যে প্রতিবিম্বিত মহাকবির মনের ছাপ, তাঁর বাগ্‌বৈভব। এ রকম ভ্রমণসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের মধ্যেই আছে এ-যুগের মহাকবির বিশ্ববিজয়ের চমকপ্রদ ইতিহাস। যখন যে দেশে তিনি গিয়েছেন সেখানেই তিনি পেয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জয়মাল্য। ভারতবর্ষের নবজন্ম হয়েছে তাঁর জীবনের নানা

পর্যায়ের ভ্রমণের মধ্যে। কবি চিরকালই সুদূরের পিয়াসী। পৃথিবীর পথে নেমে শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছেন সবকিছু—এই হোল বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়েই তিনি স্বদেশের অতীত গৌরবকে পৃথিবীর সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন আর দেশে-দেশে বহন করে নিয়ে গেছেন ভারতের উদার বাণী। নিয়ে গেছেন শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ তাই আধুনিক ভারতের বাণীদূত।

কবি গেলেন জাপানে ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি।

প্রাচ্যের সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। বহুকাল থেকে তাঁর এই জাপান দেখবার ইচ্ছা।

কোবে বন্দরে এসে রবীন্দ্রনাথ যেদিন নামলেন, সেদিন সকলে তাঁকে রাজসম্মানে সম্মানিত করেছিল।

টোকিওতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পী টাইকানের বাড়িতে। একদা এই শিল্পী টাইকান এবং শিল্পরসিক ওকাকুরা তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। জাপান ভারতীয় কবির প্রতি উদার সম্মান দেখাল। কিন্তু তখনকার জাপানের সাম্রাজ্যলোলুপতার মধ্যে শিল্পরসিক জাপানের আদর্শবাদের সন্ধান না পেয়ে কবির চিত্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবি তাঁর এক ভাষণে জাপানের এই উদ্ধত প্রকৃতির নিন্দা না করে পারলেন না। তারপর জাপান থেকে তিনি এলেন আমেরিকা। 'প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে চললেন।' এবারকার ভ্রমণ ছিল দশমাসের এবং এই সময়ের মধ্যে এই ভ্রমণ এবং বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেশামিশি করে জগৎটাকে তিনি যেন দেখলেন নূতন ভাবে। তাই তো লিখলেন: 'দেশের গণ্ডি আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয় মধ্যে এক দেশ করে তুললে তবে আমি ছুটি পাব।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কবি চললেন য়ুরোপে।

যুদ্ধদানবের তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষত-বিক্ষত য়ুরোপ। লোকসমুদ্র মন্থন হয়ে গেছে। জেগে উঠেছে নূতন গণদেবতা। শুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পালা। তাঁর এবারকার য়ুরোপ ভ্রমণ ছিল তাই বিশেষত্বপূর্ণ। লণ্ডনে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোল, মনীষীদের সঙ্গে ভাব বিনিময় হোল আর নূতন করে পরিচয় হোল উদ্বাস্তু রুশীয় চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোএরিখের সঙ্গে। তাঁর ছবি দেখে কবি বিস্মিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এবার ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিতে না দিতেই নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। গীতাঞ্জলির বাণী তখন ছড়িয়ে পড়েছে য়ুরোপের নানা দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। ইংলণ্ড থেকে কবি গেলেন ফ্রান্সে। আতিথ্য গ্রহণ করলেন প্যারিসের এক ধনীর বাড়িতে। শহর থেকে দূরে, সীন নদীর তীরে শান্ত পরিবেশ মুগ্ধ করল কবির চিত্তকে। 'প্যারিস থেকে একদিন মোটরে করে কবি ফ্রান্সের রণবিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে যান। চারদিকের গাছপালা কঙ্কালসার দাঁড়িয়ে, ইতস্ততঃ কামানের গোলার গভীর গর্ত। আধভাঙা ঘরবাড়ি চার্চ ফ্যাক্টরি এখানে সেখানে। সে এক বিশাল শ্মশানের মূর্তি। এই দৃশ্যে কবির চিত্তে নিদারুণ আঘাত লাগল; তাঁর মনে হোল এতকালের মানবসভ্যতার এই পরিণতি! এই সমস্যার সমাধান কী এবং কোথায়, এই মর্মান্তিক প্রশ্নই তাঁর কাছে সব থেকে বড় হয়ে উঠল।'

এখানে ফরাসী মনীষীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোল—আঁরি বের্গসঁ, সিলভ্যাঁ লেভি—আরো কতজন। সাক্ষাৎ হোল রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে। দেখা হোল পেট্রিক গেডিসের সঙ্গে। এই অসামান্য ভাবুক ও কর্মী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। লেভির পাণ্ডিত্য ও সৌজন্যে কবি মুগ্ধ হলেন। ইনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের আলোকে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা গুণী ও জ্ঞানী বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতে

এসেছেন নানা সময়ে। নবভারতের নূতন নালন্দা হয়ে উঠেছিল সেদিন কবির বিশ্বভারতী।

প্যারিস থেকে এলেন ওলন্দাজদের দেশে। এখানেও শহর থেকে দূরে পল্লীপরিবেশে এক ধনীর গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমস্টারডাম, হেগ, লাইডেন, রটারডামে বক্তৃতা দিলেন। রটারডামের প্রধান চার্চের বেদী থেকে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। এ-সম্মান সেদিন কোনো অখৃষ্টানের পক্ষেই ছিল দুর্লভ। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম পাশাপাশি দেশ। ব্রুসেলসের বিচারালয়ের বিশাল কক্ষে কবির বক্তৃতা হয়। সর্বত্রই তিনি প্রচার করেছেন বিশ্বভারতীর মর্মবাণী। এলেন সুইসদের দেশে। লুসার্‌ণ্‌, বাস্‌ল, জুরিখ প্রভৃতি স্থানে সফর করলেন। 'লুসাণে এসে খবর পেলেন যে জর্মানরা কবির জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট জর্মান সাহিত্যের রাশি রাশি গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিয়েছে তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে।' কবির পক্ষে সেদিন এ ছিল অভাবনীয় অভিনন্দন -তাঁর প্রত্যাশার অতীত। এখান থেকে কবি জর্মেনির ডার্মস্টাট ও হামবুর্গ হয়ে এলেন ডেনমার্কে। রাজধানী কোপেন-হেগেন শহরে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন সে কী বিরাট জনতা রেল স্টেশনে! নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ভারতীয় কবিকে দেখবার জন্য সে কী আগ্রহ! কোপেনহেগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলেন বক্তৃতা। বক্তৃতার পর ছাত্রেরা মশাল জ্বেলে শোভাযাত্রা করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। রাজপথে সে কী উল্লাস, সে কি জয়ধ্বনি! কবি সহাস্যমুখে গ্রহণ করেন সেই অভিনন্দন। ডেনমার্ক থেকে ষ্টকহলম। স্টেশনে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্যরা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন স্বাগত। যে-ভারতীয় কবিকে তাঁরা নোবেল প্রাইজ দিয়েছেন তিনিই আজ তাঁদের মধ্যে উপস্থিত। তাই সমস্ত শহর যেন সেদিন ভেঙে পড়েছিল কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। অ্যাকাডেমিতে কবি ভাষণ দিলেন। সে-ভাষণ শুনে সকলের ধারণা হোল যোগ্য ব্যক্তিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই সভায় একজন পণ্ডিত বলেছিলেন যে,

নোবেল পুরস্কার আজ পর্যন্ত অনেকেই পেয়েছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শিল্প ও সাধনা এ দুয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ যে রকমভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি।

সুইডেন থেকে কবি এলেন জর্মেনিতে।

গ্যেটে ও শিলারের জর্মেনি।

বার্লিনে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন ধনকুবের স্টাইনেশের গৃহে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে নিমন্ত্রণ করলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সে-বক্তৃতা শোনবার জন্যে জনসমাবেশ হয়েছিল বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক সমবেত হয়েছিল ভারতীয় কবিকে দেখতে। বক্তৃতা শেষ করে কবি যখন বাইরে এলেন, দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুধারে। সেই বিরাট জনতার কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি আর উল্লাস বার্লিনের রাজপথকে কাঁপিয়ে তুললো। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'র তখন জর্মেন ভাষায় অনুবাদ বেরিয়েছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল—এমন ভালো লেগেছিল এ-বই তাদের। ফ্রান্সের সৌস্বর্ন বর্শা বদ্যালয়েও কবি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এইখানেই কবি তাঁর বিখ্যাত ভাষণ 'তপোবনের বাণী' শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ জনপুঞ্জ নীরবে বিনয়-নম্র চিত্তে শুনেছিল তাঁর সেই বাণী। তাঁর বাক্যের ছন্দ আর তাল। তাঁর অসাধারণ কণ্ঠস্বর সকলকে করল অভিভূত। সেই কান্তিমান দীর্ঘ উন্নত দেহ, সেই বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত সুঠাম মূর্তি দেখে কারো যেন সাধ মেটে না। তারা তাঁর প্রসারিত পরিচ্ছদের কিনারার ধূলো ভক্তির সঙ্গে চুম্বন করে মুছে নেয়। য়ুরোপ যেন নতি স্বীকার করল ভারতের কাছে।

য়ুরোপ থেকে ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ।

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলো নিমন্ত্রণ।

কবি এবার বেরুলেন পূর্ব এশিয়া ভ্রমণে ১৯২৪ সালে।

পথে তিনি রেঙ্গুন, মালয়দ্বীপ, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ এইসব

স্থানগুলি দর্শন করলেন। সর্বত্রই পেলেন রাজকীয় সম্মান। রবীন্দ্রনাথ এলেন চীন দেশে। পিকিঙে চীন সম্রাটের প্রাসাদে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে তিনি এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা আর চীন ও ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইখানে তাঁর জন্মদিনে চীনারা তাঁর নামকরণ করেন, 'চু-চেন্-তাং' অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারতসূর্য। তাঁর জন্মদিনে চীনারা কবিকে নববস্ত্র আর অনেকরকম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। সেইদিন সেই নববস্ত্র পরিধান করে কবি বলেছিলেন: 'আমি যেন সূর্যের মতন প্রতিদিন নূতন জীবন লাভ করে নূতন নূতন ভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।' এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে রবীন্দ্রনাথের এই দুই-লাইনের কবিতায়:

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নূতন প্রভাতে জাগে নব জন্ম লভি।

এইভাবেই সেদিন বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ শান্তির বাণী আর মুক্তির বার্তা শুনিয়েছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষকে।

পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণ শেষ করে ফিরতেই আবার আহ্বান এলো য়ুরোপ থেকে। এবার নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সর্বপ্রথমে গেলেন ইতালিতে। এখানে কবি যে ধরনের অভ্যর্থনা পেলেন তা যে-কোনো সম্রাটের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। স্বয়ং মুশোলিনী তাঁকে সাদর নমস্কার জানিয়েছিলেন। সেদিন ভারত পরাধীন ছিল, কিন্তু ভারতের কবি সারা পৃথিবীতে যে-সম্মান লাভ করেছিলেন তা এক অকল্পিত ব্যাপার। বলতে গেলে সমগ্র য়ুরোপ তাঁকে জানিয়েছিল হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি। য়ুরোপের যে-দেশেই তিনি পা দিয়েছেন, তাঁর চারদিকে এসে জড়ো হয়েছেন সে-দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। কবি এসেছেন, সাহিত্যিক এসেছেন, শিল্পী এসেছেন, ধর্মযাজকরাও বাদ যান নি আর বড়ো বড়ো রাজপুরুষদের তো কথাই নেই। সেদিন ভারতবর্ষের বাইরে একা রবীন্দ্রনাথই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রতীক।

কেন? তিনি তো একজন পরাধীন দেশের কবি বইত আর কিছু নন। না, তা নয়। য়ুরোপ শক্তির প্রতীক—মানুষের শক্তির চরম বিকাশ দেখতে হোলে তার দিকেই তাকাতে হয়। কিন্তু য়ুরোপ নিজে চায় আরো বড়ো আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন এক বাণী তারা শুনলো, যা তাদের জড়বিজ্ঞানের আদর্শের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—আর যে কেবল ভারতবর্ষই দিতে পারে। ক্ষমতামদগর্বী য়ুরোপ তাঁরই হাত দিয়ে সেদিন পেয়েছিল ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা-ই। তাই না রবীন্দ্রনামে মুখরিত হয়েছিল সমগ্র য়ুরোপ। য়ুরোপ থেকে ফিরে আসতেই নিমন্ত্রণ এলো পূর্ব-এশিয়ার ভারতদ্বীপপুঞ্জ থেকে। চীন যাওয়ার পথে আগে তিনি জাভা, বালীদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরিচয় ততো নিবিড় হয়ে ওঠে নি। এইবারকার নিমন্ত্রণ বিশেষভাবে এইসব দেশ দেখবার জন্যে।

১৯২৭। জুলাই মাস।

কবি জাভা যাত্রা করলেন।

কতকাল আগেকার কথা। দু-হাজার বছর হবে। ভারতবর্ষে তখন হিন্দু-রাজত্ব। হিন্দুরা তখন ভারতবর্ষের বাইরে দিগ্বিজয় করে বেড়াতেন। সে দিগ্বিজয় ছিল সাংস্কৃতিক। ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান ও ধর্ম তাঁরা পণ্য হিসাবে নিয়ে যেতেন। তার সঙ্গে ছিল হৃদয়। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারত জাভা, বালী, সুমাত্রা ও মালয়ে। অতীত কীর্তির নিদর্শন এইসব দেশে আজো বর্তমান। রবীন্দ্রনাথকে তারা এইসব দেখবার জন্যই জানিয়েছিল আমন্ত্রণ। বালীদ্বীপে পৌঁছে কবির দৃষ্টিপথে যে-অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হোল, তা দেখে মুগ্ধ চিত্তে তিনি লিখলেন: 'দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনামূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তীর্ণ।' তেমনি বরবদুর মন্দিরে হিন্দু সভ্যতার বিরাট চিহ্ন নানাভাবে আঁকা রয়েছে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। দ্বীপময় ভারত

কবির কল্পনাকে করে উদ্দীপ্ত—দূর অতীতের দিকে চলে যায় তাঁর দৃষ্টি। কতকাল আগে ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতি এদেশে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ—গড়ে উঠল বৃহত্তর ভারত---সেই ইতিহাস আজ তিনি স্মরণ করেন বরবতুরের বিশাল মন্দিরের তলায় দাঁড়িয়ে। স্মরণ করেন আর ভারতের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক লেনদেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছা জাগে তাঁর মনে। কবির মনের সেই ইচ্ছাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'সাগরিকা' কবিতায় যার মধ্যে 'ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে' কবি বলেছেন ঃ—

এনেছি শুধু বীণা
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

১৯৩০। একাদশবার বিদেশভ্রমণে বের হলেন রবীন্দ্রনাথ।

এখন তিনি শুধু বাংলার কবি নন, ভারতবর্ষের কবি নন,—তিনি এখন বিশ্বকবি। তাই সকল দেশ থেকে আসে তাঁর নিমন্ত্রণ। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন অথবা জোড়াসাঁকো আজ আর রবির আলোকে ধরে রাখতে পারে না--রবির আলো আজ সারা ভুবনে পরিব্যাপ্ত। নিজের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই কি কম ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি? ওদিকে সিংহলও বাদ যায় নি। শুধু কি ভ্রমণ করেই বেড়িয়েছেন? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিমন্ত্রণ করলো 'হিবার্ট' বক্তৃতা দেবার জন্য। 'এ-সম্মানের আহ্বান এ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় কেন, কোনো প্রাচ্য-দেশবাসীই পান নি।' এই বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য ছিল 'মানুষের ধর্ম'। ভারতের কবি য়ুরোপকে দিলেন মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা। গুরুর বেদীতে বসল ভারতবর্ষ। কবির জীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই বছরই তাঁর শেষ য়ুরোপ ভ্রমণ। হিবার্ট লেকচার এই বছরের ঘটনা। এই পর্যায়ের ভ্রমণেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়া যান। মস্কৌ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

এখানকার পাইওনিয়ার কম্যুনে গিয়েছিলেন কবি। এটা কিশোর-কিশোরীদের সংস্থা। সোভিয়েট ছেলেমেয়েরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো, নানা কথা জিজ্ঞাসা করলো তাঁকে; শেষে তারা কবির কণ্ঠে একটি গান শুনতে চাইলো। রবীন্দ্রনাথ তাদের শোনালেন 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি। সে কিন্নর কণ্ঠ তাদের মুগ্ধ করলো। সেখানে থাকতে গেলেন একদিন কৃষকদের খামারে, 'চাষীদের সঙ্গে অনেক প্রশ্নোত্তর হোল--কবি বিস্মিত হলেন নানা বিষয়ে তাদের আগ্রহ দেখে।' মস্কোর স্টেট ম্যুজিয়ামে. কবির চিত্র প্রদর্শনী পর্যন্ত হয়েছিল। রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন বহু নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে। সেইসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে।

কবির বয়স এখন সত্তর বছর। এমন সময়ে নিমন্ত্রণ এলো পারস্য থেকে--পারস্যের শাহনশাহ রেজাশাহ পেল্‌হবী স্বয়ং নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন কবিকে। সেই বয়সে আকাশপথেই তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। পারস্যের প্রাচীন শহর শিরাজ—হাফেজ ও সাদীর জন্মভূমি। সাদীর সমাধি-উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হোল। হাফেজের সমাধিস্থল দেখতে এলেন একদিন। দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় কবি হাফেজ— 'বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে হাফেজ থেকে সানন্দে আবৃত্তি করতে শুনতেন।' শিরাজ শহরে সাতদিন কাটিয়ে পারস্যের গুল্‌বেহেস্তের অতুলনীয় শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করলেন কবি। সেখান থেকে ইস্পাহান—ইস্পাহান থেকে রাজধানী তেহরানে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রেজাশাহ তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। এ বছরের জন্মদিন এখানেই উদ্‌যাপিত হয়। রাজোদ্যানে অতি সমারোহের সঙ্গে এই উৎসব হয়েছিল।

ইরাক থেকে নিমন্ত্রণ এলো। দরায়ুসের বেহিস্তান শিলালিপি খোদিত পার্বত্য পথ দিয়ে তেহারান থেকে কবি চললেন ইরাক মোটর যোগে। পথে বোগদাদ। সেখানে ভারতের কবিকে দেখবার জন্য সে কী জনতা! রাজা ফৈজল এসে সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে।

বোগদাদে যথারীতি কবিকে সংবর্ধনা জানান হোল। কিন্তু আরবের নাগরিক সভ্যতায় তার মন ভরল না। কবি চললেন মরুপ্রান্তরে বেদুইন সর্দারদের তাঁবুতে। যৌবনে যাদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন ঃ

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন !

আজ জীবনসায়াহ্নে সেই বেদুইনদের দেখতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। বেদুইনরা তাঁদের তাঁবুতে কবিকে ভোজ দিল ; তাদের রণনৃত্য দেখাল।

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ সত্যই ভারতের সংস্কৃতি ও বিশ্বসভ্যতার জীবন্ত মূর্তি, এর যথার্থ প্রতিনিধি।

আট

ভাবের ভুবনে রবীন্দ্রনাথ সম্রাট।

তিল তিল করে যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি, তেমনি বহু ও বিচিত্র ভাবের বিগ্রহমূর্তি রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদের স্তন্যরসে তিনি আবাল্য বর্ধিত। তাঁর কাব্যের মর্মস্থলে উপনিষদের তত্ত্ব—কিন্তু উপনিষদই তাঁর প্রতিভার একমাত্র উৎস নয়। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাসও আছে তাঁর কাব্যে। বিশ্ব ও মানবজীবন—এর যা কিছু বৈচিত্র্য তা তো ভগবানের লীলা। এরই অনুভূতি বৈষ্ণব ধর্মের সার কথা। রবীন্দ্রকাব্যে এই অনুভূতি উজ্জ্বলভাবেই বর্তমান। উপনিষদের জ্ঞান আর বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্ব—কবির জীবনের সাধনায় এই দুটো ভাবই এক অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে। উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা আর বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্ব এই দুই ভাবের বাণীরূপ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র কাব্য-বিতানে কত না ভাবের মণিমুক্তা ছড়ানো। তাই তো কবি নিজেই বলেছেন ঃ

শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ।

ভাবের এমন নৃত্যলীলা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায় নি। তাঁর কাব্যের দুইতট দিয়ে বয়ে চলেছে বিচিত্র রসনিগূঢ় ভাবের সুরধুনী। সেই ভাব অভাবনীয় সৌন্দর্য নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দুই মহল—এক মহলে আমরা পাই মানবজীবনের কবিকে, অন্য মহলে পাই প্রকৃতির কবিকে। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের কথাই এবার বলি।

জীবনের প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন প্রকৃতির অন্তঃপুরে। দুই চোখ দিয়ে দেখেছেন তাঁর রূপৈশ্বর্য। বাংলার নদী মাঠ প্রান্তরে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির নিরাবরণ মূর্তি। বালক বয়স

থেকেই তিনি যেন একাকী নিত্যজাগ্রত কৌতূহল নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছেন। প্রকৃতির এমন কল্পছবি পৃথিবীর আর কোনো কবি আঁকতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত, তাঁর রসদৃষ্টি প্রকৃতির রূপরস সৌন্দর্য এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেছে যে প্রকৃতি যেন তাঁর রহস্যলোকের অন্তঃপুর এই বিমুগ্ধ কবির কাছে নিঃসংকোচে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মানসসন্তান। তাই তো প্রকৃতির মর্মের বাণী তাঁর কবিতায় ঝঙ্কৃত। কবি তাই বলেছেন :

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনের নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি ওঠে পুলকে।

এই পুলকের ভিতর দিয়েই কবি অনুভব করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রাণের নিবিড় ঐক্য। রহস্যময়ী প্রকৃতি তাই তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির ভিতর দিয়েই কবি লাভ করেছেন তাঁর জীবনদেবতার সান্নিধ্য। সে কোন্ শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে চাইলেন কবি। এক বিচিত্র অনুভূতি আচ্ছন্ন করলো তাঁর কল্পনাকে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন যোগ--এক চিরপুরাতন একাত্মকতা। সেইদিন থেকে কবি জলে স্থলে আকাশে নিঃশেষে বিকীর্ণ করে দিলেন তাঁর অন্তরাত্মাকে।

প্রকৃতির ছয় ঋতুর সকল মাধুর্যই রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি যেন নিজের রসে নিজে সঞ্জীবিত। প্রকৃতির মধ্যে তিনি শুনেছেন প্রাণের স্পন্দন। তাঁর সেই শোনার মধ্যে আছে মধুর স্বাভাবিকতা, আছে বিস্তৃতি। মনে পড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা। এই ইংরেজ কবিও প্রকৃতির কবি। তিনিও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের প্রবাহধারা দেখেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে গভীরতা আছে, বিস্তৃতি নেই। শেলিও প্রকৃতির কবি। অপরিসীম মহিমা তাঁর কবিপ্রতিভার এবং তাঁরও নিসর্গকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। কিন্তু শেলিও

প্রকৃতিকে দেখেছেন প্রেম ও স্বাধীনতার আধার হিসেবেই, তাঁর কাব্যে গৌরব থাকলেও পারপূর্ণতা নেই। প্রকৃতির আরেকজন পূজারী কীটস্। তাঁর কাব্যে রসবৈচিত্র আছে, নেই মতবাদের সংকীর্ণতা। রবীন্দ্রপ্রতিভা তাই কীট্সের সমগোত্রীয়। তবু এই দুজনের মধ্যেও পার্থক্য কম নয়। কীট্সের কল্পনা পথপ্রান্তলিপ্ত বস্তুসৌন্দর্যের মহিমায় আচ্ছন্ন ; তিনি সৌন্দর্যের পরিমার্জিত রূপটাই গ্রহণ করতে ব্যগ্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন সমগ্রভাবে। শৈবালে শাদ্বলে তৃণে প্রকৃতির যে বিরাট সত্তা যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হচ্ছে, কবি তাকেই গ্রহণ করেছেন। তাই তো তাঁর অন্তরবীণায় ঝংকৃত হয়েছে প্রকৃতির এমন নব নব স্তবসংগীত।

প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা এই : 'এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর, দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।...এই পৃথিবী আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন। আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম।...আমার বসুন্ধরা এখন একফালি রৌদ্রপীতহিরণ্য অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি।'

এমনি করেই প্রকৃতি তার রূপরস বর্ণগন্ধ নিয়ে, তার স্নেহপ্রেম নিয়ে আবাল্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। এমনি করেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছেন—তাই তো পৃথিবীতে তিনিই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কল্পনায় আছে প্রাণময় প্রেমের উপলব্ধি—যা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা শেলির মধ্যে নেই। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি ও প্রেম দ্বৈতসত্তা নয়, এক অখণ্ড সত্তার দুই রূপ। 'মানসসুন্দরী'-র কথা মনে পড়ে। স্বপ্নে, সুরে, রূপে ও ভাবে এখানে একাকার হয়ে আছে অন্তঃপ্রকৃতি আর বহিঃপ্রকৃতি। কবিতাকে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির সর্বত্র। প্রকৃতি অনিন্দ্যসুন্দরী। সে তো তাঁর কবিতা-লক্ষ্মীর রূপসৌন্দর্যের মহিমাতেই। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রাণহীন কোনো নিস্পৃহ জড়-দৃশ্য নয়। সে প্রাণময়ী প্রতিমা। সন্ধ্যার কনকবর্ণে সে তার অঞ্চল রাঙিয়ে নেয়; উষার গলিত সোনা দিয়ে সে তার মেখলা গড়ায়; পূর্ণ তটিনীর তরঙ্গধারায় সে তার ললিত যৌবনখানি বিস্তার করে দেয়। কবির মনোময় লীলাবিলাসের মধ্যেই যেন বিশ্বপ্রকৃতির রূপবৈভব প্রতিবিম্বিত।

ধরিত্রীর জীবনস্পন্দন শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ। বসুন্ধরার বিস্তীর্ণ প্রাণধারার মধ্যে কবি অবলীন হয়ে থাকতে চান। কেন?

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে।

... ...

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে।

কেন এই আকুতি? কবি যে শুধু বসুন্ধরার প্রাণধারার গতিবেগই অনুভব করেছেন তা নয়, যে প্রাণতরঙ্গ বিশ্বব্যেপে লীলায়িত সৃষ্টির

উষাকাল থেকে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-বন্দনায় তাকেও রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই পৃথিবীকে কবি আদি জননী সিন্ধুর একমাত্র সন্তান বলে কল্পনা করেছেন। সাগর-কল্লোলে তিনি শুনেছেন মাতৃস্নেহের বেদনা। কবির সঙ্গে বিশ্বের যোগ তাই প্রাণরসের ঐক্যের যোগ। আমরা সবাই গাছ দেখি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৃক্ষকে এই বলে বন্দনা করেন :

অন্ধভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ প'রে ;

তারপর কালের চক্রে কত জ্যোতিষ্ক উঠছে, নিভছে। কবি এর মধ্যে দেখেছেন জীবনের লীলা। আমরা নক্ষত্র দেখি, আকাশ দেখি। আর রবীন্দ্রনাথ যখন সেই আকাশ সেই নক্ষত্র দেখেছেন তখন তিনি বলেছেন :

জানিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূণ্য মাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা।

এমনি করেই কবি জড়ের মধ্যে জীবনের সন্ধান পেয়েছেন : প্রকৃতির কবি এমন আর কে ?

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

ঋতুরঙ্গশালায় বর্ষার আহ্বান করলেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে। আকাশে সজল মেঘের সমারোহ, তরুলতিকা গীতময়, তমালকুঞ্জে শিখীর নয়নলোভন নৃত্য আর মত্ত দাদুরির ডাক, বাতাসে কদম্বরেণু— বর্ষার এই ভুবনমোহন রূপ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা দিল। কী এক সুগভীর আকর্ষণ তিনি বোধ করতেন প্রকৃতির ঐশ্বর্যের প্রতি।

এখানে মনে পড়ে কালিদাসের কথা। উজ্জয়িনীর কবির 'ঋতুসংহার' কাব্য আর বাংলার কবির 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' কাব্য যেন একই সুরে গাঁথা। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা,—রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস দু'জনাই বর্ষার কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ক্ষণিকের লীলা নয়—এ তাঁর কাছে এসেছে বহুযুগের ওপার থেকে, শত শত যুগের গীতিকার পথ বেয়ে। নববর্ষার শ্যাম সমারোহ ভরে তুলেছে কবির হৃদয় উপকূল; তার রাজোচিত ঐশ্বর্য, তার উন্মাদনা, তার গীতিমুখর সৌরভ—এসব মিলে তাঁর মুগ্ধ কবিচিত্তে গড়ে তুলেছে পরিপূর্ণতার একটি ছবি।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

এই মন্ত্রে কবি আবাহন করলেন শরতের। নবীনতার ঐশ্বর্য নিয়ে এলো শরৎ। সে বসন্তের দোসর। শালিধান, কাসের গুচ্ছ ও শিউলি ফুলের মালা—এরই সমাবেশে নবীনতার প্রতিমূর্তিরূপে শরৎ দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে। শরতের রাজশ্রী নবীনতার শ্রী, লঘু মেঘের সঞ্চলন থেকে আহৃত সেই শ্রী। তারপর শরতের নবীনতা ঝরে পড়ল হেমন্তে। পৃথিবী কুয়াশায় আচ্ছন্ন—যেন অবগুণ্ঠিতা নারী। মাঠে মাঠে পাকা ধান—তার মধ্যে কবি দেখেছেন পরিপূর্ণতা। শীত এলো, পৃথিবী সংকুচিত হয়ে পড়ল। পৌষের তপোবন একেবারে রিক্তপত্র। হেমন্তের ও শিশিরের রূপে কবির কল্পনা পরিপুষ্টি লাভ করে নি—কারণ তিনি ঐশ্বর্যের কবি।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃ ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ॥

গ্রীষ্মের আবাহন করলেন কবি এই অগ্নিমন্ত্রে। রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীষ্মের বর্ণনায়। রবি কিরণে আতপ্ত এই ঋতুর যে গৌরব তিনি দেখেছেন, তা পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখতে পারেন বা দেখাতে পারেন নি। রিক্ততাকে এমন সম্ভ্রমের চক্ষে আর কেউ কখনো দেখেছেন কিনা সন্দেহ। তাই তো মহেশ্বর তাঁর কল্পনাকে বারংবার আন্দোলিত করে। গ্রীষ্মের ঐশ্বর্য রিক্ততার ঐশ্বর্য। তার শক্তি সর্বস্ব ত্যাগের কঠিন শক্তি। বৈশাখ তাই কবির কাছে এলো দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীরূপে। মাথায় তার পিঙ্গল জটাজাল। সেই জটাজাল ধুলায় ধূসর রুক্ষ। দিগন্ত দগ্ধতাম্র। সেখান থেকে সম্ভৃক্ষিত গ্রীষ্মের অনুচর মধ্যাহ্ন আকাশে নৃত্য করে। ধরণী গৈরিকে সজ্জিত—যেন তপস্বিনী। গ্রীষ্মের এমন রূপ আর কোন্ কবি দেখেছেন ?

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নববরবেশে।

এই মন্ত্রে কবি গাইলেন বসন্ত-বন্দনা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বকীয়তা আছে ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনায়। শীতে সমস্ত পৃথিবী নিঃস্ব, বসন্তে সে সজ্জিত হয় নবীনবেশে। এরই মধ্যে কবি দেখেছেন অনন্ত যৌবনের মূর্তি। শীতের বার্ধক্য হার মানে বসন্তের নবীনতার কাছে। বসন্তের চিরনবীনতার মধ্যে কবি অনুভব করেছেন অযুত বছরের বসন্তের প্রেরণা। তাই তো তিনি বসন্তের উদ্দেশে বললেন ঃ

সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্তপ্রবীন
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।

প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের লীলা দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তো তিনি আঁকতে পেরেছেন প্রকৃতির প্রাণপ্রবাহের সহজ নিরবলেপ রূপ। 'ঋতুরঙ্গে'র মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নটরাজ্যের নৃত্য। কবি বলেছেন: 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হয়ে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ নটরাজের কবি শিষ্য; তাঁর নাটের অঙ্গনে তিনি গ্রহণ করেছেন মুক্তির মন্ত্র। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ এমন করেই তাঁর জীবনদেবতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নন—ব্যক্তিগত দেবতাও নন। ইনি বসন্ত জগতের প্রাণ। কবি তাঁর গভীরতম সত্তাকে বিশ্বের মধ্যে অনুভব করেছেন। বলেছেন:

এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত সুধা মোরা যে পেয়েছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

এই বিশ্ববোধই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার স্বরূপ। তাই জীবন-দেবতার প্রেম মহিমায় কবিসত্তা মহীয়ান। তাঁর জীবনদেবতা বিচিত্র অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবিকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। সেই পরিপূর্ণতার আদর্শের মর্মকথা হোল:

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।

নয়

'এবার যে ঐ এলো সর্বনেশে গো।...'

বৈশাখ, ১৩২১। রামগড়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। হিমালয় প্রদেশে আলমোড়ার কাছে রামগড়। সঙ্গে আছেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী আর কন্যা মীরা। কিছুদিন পরে আরো অনেকেই এলেন—রথীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি। রামগড়ের সেই মনোরম পার্বত্য পরিবেশে আনন্দ ও উৎসব চলেছে খুবই। কিন্তু কবির মনে একটা বেদনা। সেই বেদনার অনুভূতি থেকে লিখলেন—'এবার যে এলো ঐ সর্বনেশে গো।' লিখলেন—'আমরা চলি সমুখ পানে।' এর পরই য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এলো। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'বলাকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতাটি যখন লিখছি তখন কিছু খবর না পেয়েও আমার মন যেন জগতের কোনো এক মহা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল। ১৩২১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ এই কবিতা আমার লেখা, য়ুরোপীয় যুদ্ধের খবর এলো তার পরে। একে যুদ্ধ বললে ঠিক বলা হবে না। মানবের এক মহাযুগসন্ধি সমাগত। একটা অতীব ভীষণান্ধকার রাত্রি অবসান-প্রায়। নবযুগের রক্তবর্ণ অরুণোদয় পূর্বাকাশে যেন দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই আমার মনের মধ্যে এমন একটা অকারণ উদ্বেগ এসেছিল। মানবাত্মার নতুন অভিযান যে আসছে তার সূচনা যেন পাচ্ছি।'

এই নবারুণের অর্ঘ্য রচনা করলেন কবি তাঁর 'বলাকা'-কাব্য দিয়ে।

তাঁর জীবনব্যাপী ছন্দসাধনার ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠল এই কাব্যে।

রবীন্দ্রকাব্যের জগৎ যেন একটি সাতমহলা প্রাসাদ।

সেই প্রাসাদের মহলে মহলে ছড়ানো অজস্র মণি-মাণিক্য।

আজ থেকে শতবর্ষ পরে যখন কোনো কাব্যরসিক সেইসব

মণিমাণিক্য কুড়াতে ঢুকবেন সেই প্রাসাদে—তখন তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-রত্নটির সন্ধান পাবেন সেটিই হোল 'বলাকা'।

কবির কাব্যদৃষ্টির এক নূতন দিক্‌-পরিবর্তন এখান থেকেই।

রবীন্দ্র কাব্যাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র 'বলাকা'। তাঁর জীবন-সীমান্তের কাব্য। গোধূলির ধূসর শ্রীমণ্ডিত এর প্রত্যেকটি কবিতা। তাঁর শিল্পতরুর নবীন পত্রসম্ভার এই 'বলাকা'। তাঁর কাব্যমালঞ্চের পুরাতন রূপ ও রীতি ঝরে পড়ল, ফুটে উঠল এইবার নব নব সৃষ্টির পত্রপুষ্প। পদ্যবন্ধে এলো গদ্যবন্ধের মুক্তি। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর থেকে শিলাইদহের পদ্মাতীর আর ওদিকে শান্তিনিকেতন থেকে রামগড়—এই বিস্তৃত ও বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই বলাকা মেলে দিয়েছে তার ডানা।

গতিধর্মের কাব্য বলাকা।

কবি নিজেই বলেছেন: 'আমাদের রক্তের মধ্যে গতির অতি পুরাতন তাগিদ রয়েচে। তাই আমার মধ্যে সদাই এই গতির জন্য ব্যাকুলতা। আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। এদেশে এই গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র। চলবার ব্যাকুলতাটি আমার জন্মগত জিনিস।' বলাকা রবীন্দ্রমানসের পরিণত ফল; এর সূচনা কিন্তু তাঁর সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে। কবির সেই জীবননির্ঝরই আজ বলাকাতে যেন এক তরঙ্গ-উদ্বেল নদী হয়ে দিল।

প্রাণের সৃজনীশক্তির নূতন মন্ত্র পাই এই কাব্যে। কবি এখানে তাঁর জীবনধর্মের কথাই বলেছেন। যে সৃজনীশক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের মধ্যে তারই লীলা তিনি দেখেছেন সমস্ত বিশ্বময়। দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে, অভিঘাতের ভেতর দিয়ে সমস্ত বিশ্বময় চলেছে প্রাণের লীলা। সেই অনন্ত বিশ্বপ্রবাহ বাঁধা পড়েছে বলাকা কাব্যে। গতির স্তবগানে মুখরিত বলাকা কাব্যের দেউল। ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে মহাচ্ছন্দে। কবি যেন তাই প্রত্যক্ষ করলেন:

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে

পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো ॥

একদা রবীন্দ্রনাথ লোহিত সাগর দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপরূপ সূর্যাস্ত হোল। কিন্তু সে অপরূপ রমনীয়তাকে ধরা গেল না। সে চঞ্চলতাকে তিনি তখন ধরতে পারলেন না। সেই লোহিত সাগরে অস্তগামী সূর্যের আলোকে বর্ণের যে মহোৎসব সেদিন কবি দেখেছিলেন তা তাঁর মনেই রয়ে গেল। নক্ষত্রের মতো তাই পরে দীপ্যমান হয়ে উঠলো বলাকা কাব্যের 'চঞ্চলা' কবিতায়। বিরাট নদী নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, তার ধারার গতি, সংগীত, তার বিপুল বেগ—তার সমস্ত অর্থকে আজ কবি প্রকাশ করলেন। কেমন করে ধাবমান অদৃশ্য সৃষ্টি হতে দৃশ্য সৃষ্টির তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে—কবি আজ তারই গান গাইলেন। অপূর্ব ছন্দোময়ী গতিতে নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে—তাই তো সে সুন্দরী চঞ্চলা অপ্সরী। তাকে না দেখা গেলেও সে অলক্ষ্য সুন্দরী। নদীর নৃত্যধারার মন্দাকিনীপ্রবাহে বিশ্বজগৎ নিরন্তর হয়ে উঠছে শুচি ও সুন্দর। তার গতিবেগেই তো এই অসীম আকাশ নির্মল নীল পবিত্র।

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও—
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

স্তব্ধচিত্তে বসে আছেন কবি বিপুলা এক নদীর তটে। তাঁর মনেও

আজ লেগেছে বিশ্বজগতের গতির বেগ। বিশ্বচরাচরে নৃত্য করে চলেছে কোন্ এক অদৃশ্য নটী ; তার কটিতে মেখলা—শিঞ্জনিকার মতো শিঞ্জিত ও বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই দৃশ্যমান ভুবন নিয়ে—তার ধ্বনিতে ও ছটায় উতলা হয়ে মেতে উঠছে তাঁর মন। সপ্ত সাগরের নদ-নদী নির্ঝরিণীর বায়ুর অরণ্যের সর্ববিশ্বের নৃত্য-তরঙ্গ রক্তের ব্যাকুল ছন্দে বাজছে যে রবীন্দ্রনাথের নাড়িতে নাড়িতে। স্তব্ধচিত্তে কবি ভাবছেন অনাদিকালের কথা। মন বলছে : এলাম কোথা হতে ? কোথায় আমার আদি মূল ? এই যে আমি নির্ঝরের মতো প্রপাত হতে প্রপাতে স্খলিত হতে হতে, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে নিঃশব্দে ধেয়ে চলেছি—কোথায় এর আরম্ভ, আর কোথায়ই বা এর অবসান ?

পটে আঁকা একটি ছবিকে কবি জিজ্ঞাসা করছেন :

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?

একটা বিরাট রূপ নিয়ে এখানে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। সে-কল্পনার ব্যাপ্তি আমাদের বিস্মিত করে, স্তম্ভিত করে। তত্ত্ব এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কল্পনার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। আমরা সবাই জানি ছবি শুধু ছবি, চিরচঞ্চলের মাঝে শান্ত। কিন্তু কবি দেখেছেন রেখার বন্ধনে সে-ছবি স্থির নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার যে পূর্ণ উচ্ছসিত রূপ আমরা দেখেছি সোনার তরী আর চিত্রা কাব্যে, বলাকায় নেমেছে তারই বন্যাবেগ। তিনি অনুভব করলেন এক আলোকিত মুহূর্তে—ছবি শুধু পটের উপর আঁকা কতকগুলো রেখা ও বর্ণ নয়, তার মধ্যেও আছে আকাশের গ্রহ-চন্দ্র-তারকার মতো কোনো নিগূঢ় সত্য। স্থিরতার অন্তঃপুরে বদ্ধ গতিহীন হয়ে ছবি শুধু পটে আঁকা থাকবে, কবির কল্পনা এতে সায় দেয় না। ছবিরও সার্থকতা আছে। শিল্পীর হাতের সৃষ্টি তাই পরিপূর্ণতা পেল কবির হাতে। রেখার বন্ধনে স্তব্ধ ছবির মধ্যে আনন্দের রূপ প্রত্যক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ—অনুভব করলেন সীমার রেখায় আনন্দের এক বিপুল বেগ। ছবির মধ্যেই বিশ্বচরাচর যেন দীপ্যমান।

এই কল্পনা আরো বিরাট রূপ নিলো শাজাহান কবিতায়—রবীন্দ্র-কাব্যজগতে এই কবিতাটি যেন দ্বিতীয় তাজমহল, তেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে পাই কবি-মনের একটি অপূর্ব ঘোষণা—'ভুলি নাই, ভুলি নাই।' যমুনার তীরে বহুমূল্য এই পাষাণস্তূপ সত্য হয়ে উঠেছে সম্রাটের প্রেমের বেদনায়। তাজমহল তাই শাজাহানের হৃদয়ের ছবি। তাঁর প্রেমের গৌরবেই মর্মরে তৈরি এই স্মৃতিসৌধ ধন্য। কালের হৃদয় জয় করতে পারে একমাত্র সৌন্দর্য, তাই বুঝি সম্রাট তাজমহলের সৌন্দর্য-মালা গলায় দিয়ে মহাকালকে বরণ করে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায় ভুলিয়ে তাকে আপন করে স্থির করে নিত্য করে রাখতে চেয়েছিলেন। মানুষের জীবন বিশ্বজীবনের গতির নিয়মে চলেছে। কোনো একটি স্তরে, কোনো একটি অবস্থায় সে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, খণ্ড করে, বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না। তাই তো কবি বললেন ঃ

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

অনন্ত জীবনপ্রবাহের অনুভূতি দিয়ে তৈরি এই মর্মরসৌধ শুধু প্রেমের স্মারক নয়, প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি। শিল্পের মহিমামণ্ডিত হয়ে এই প্রেম পুষ্পাঞ্জলি আজ তাই দেশকালের অতীত হয়ে নিখিল নর-নারীর প্রেমের স্মারক হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনায় সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে এই প্রশান্ত পাষাণের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করলেন নির্বন্ধন মানবাত্মার অভিসার পথ। তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি তাঁর প্রেমকে পেছনে টানে নি, জীবনের পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। বিশ্বমানবের অনুভূতির মধ্যে জীবনপ্রবাহের এই অনুভূতিই মানবজীবনের অক্ষয় আলোক। এই চিরন্তন সত্যই আত্মপ্রকাশ করেছে মর্মরে রচিত প্রেমের এই পুষ্পাঞ্জলির মধ্যে। এরও পাষাণে পাষাণে সেই বিরাটের স্তবগান

নিঃশব্দে ঝঙ্কৃত। সত্য বিরাট। বিরাট বলেই চিরন্তন তার গতিপথ। কোনোবস্তুই তার পথরোধ করতে পারে না। শাজাহানও পারেন নি। তাই তো সর্বভারমুক্ত সেই সম্রাট-পথিক পৃথিবীর সব বন্ধনের অতীত এক চিরযাত্রী।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের শ্রীনগর। কবি এখানে এসেছেন বেড়াতে। কার্তিকের নির্মল আকাশ। পদ্মার মতো ঝিলম নদী তাঁর পায়ের তলায়। ঝিলমের বুকে সন্ধ্যা নামলো। বোটের ছাদে বসে আছেন কবি। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো নদীর বুকে, তার স্রোত গেল কালো হয়ে। ওপারে গিরিতটতলে সারি সারি দেবদারু গাছ—গাছের নীচেও জমাট অন্ধকার। চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। এমন সময় বুনো হাঁসের দল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তরুশ্রেণীর মূক আকুতি, বলাকার পক্ষ বিধূনন সহসা চমক লাগিয়ে দিল কবির মনে, কবি-হৃদয়ের গূঢ় অনুভবে জাগালো সাড়া :

মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে মরিছে গুমরি।

পদ্মার বোটে থাকতে কবি কতবার শুনেছেন হাঁসের দল চলেছে শব্দ করতে করতে। সেদিন বিধুর সন্ধ্যার বিজন স্তব্ধতার মধ্যে হংসদূতের বাণী কবি চিত্তে আঘাত হেনেছিল, কিন্তু কোনো সাড়া জাগায় নি। আজ কিন্তু ঝিলমের তীরে এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে কবি যেন অনুভব করলেন—ঝঞ্ঝামদমত্ত পাখাদের পাখায় আনন্দের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি। সে-হাসি আকাশকে তরঙ্গিত করে শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। শান্তিসুপ্ত আকাশ চমকে জেগে উঠল। আকাশ বিস্মিত হোল। স্তব্ধ আকাশ তরঙ্গিত হোল। ধ্যানরত গিরিশ্রেণী চমকে উঠলো, রোমাঞ্চিত হোল দেওদারবন।

রোমাঞ্চিত হোল কবির মন। উদ্দীপ্ত হোল তাঁর কল্পনা।

ঝঞ্ঝামদমত্ত এই পাখীর বাণী যেন এক পলকের মধ্যে পুলকিত বেগের আবেগ জাগিয়ে দিলো তাঁর অন্তরে। হংসদূতের বাণী প্রতি-ধ্বনিত হোল তাঁর হৃদয়ে। আপন অন্তর দিয়ে তিনি সৃষ্টির গূঢ় প্রকাশবেদনা অনুভব করলেন সেই সান্ধ্য নীরব স্তব্ধতার মধ্যে বসে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বহু আলোকিত মূহূর্তের মধ্যে এটি একটি। নিশ্চল চিত্তে এলো একটা বেগের চঞ্চলতা, জেগে উঠলো একটা চলবার আকাঙ্ক্ষা। কবির মনে হোল—ছুটে চলা সেই বেগের বাণীতে অচল পর্বতও যেন ব্যাকুল হয়ে কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘের মত উধাও হয়ে উড়ে যেতে চাইল; সেই সঙ্গে তরুশ্রেণীও মাটির বাঁধন ছিড়ে পাখীর মতো পাখা মেলে দিশাহারা হয়ে উড়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হলো। বেদনার তরঙ্গ জাগল আকাশের হৃদয়ের মধ্যে—সেও বুঝি সুদূরে উধাও হয়ে যেতে চায়। চারদিকে নিশ্চল কিছুই নেই, সবই সচল। এর ভেতর দিয়েই কবি তুলে ধরলেন বিশ্বের নিগূঢ় সত্যটি। মানব-জগতেও আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা যুগ হতে যুগান্তরে বলাকার মত ক্রমাগত উড়েই চলেছে। বলাকায় তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিরুদ্দেশের প্রতি মানবচিত্তের অভিসার। কবিজীবনে বলাকার উৎস গভীরে নিহিত। শুরু থেকে শেষ—এ গতিরই কাব্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়ে অবধি কবিতায়, নাটকে, গানে, সর্বত্র প্রণতি জানিয়েছেন বিশ্বগতিকে। প্রকৃতিতে ও মানবে যে চিরপ্রবহমাণ জীবন-লীলা, কবি তাঁর নানা রচনায় তারই বার্তা দিয়েছেন। গৃহসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ব্যথিত মানব-আত্মার কান্না পৃথিবীতে এই প্রথম বাণীরূপ পেলো রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে। বিশ্বছন্দের প্রাণস্পন্দনই বলাকার ফলশ্রুতি। স্পন্দিতচিত্ত মানবজগত আর প্রাণময় প্রকৃতিরাজ্য—দুই-ই শাশ্বত হয়ে রইল মহাকবির এই দুর্লভ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে। এরই ভেতর দিয়ে শতবর্ণে বিচ্ছুরিত রবির আলো।

কিন্তু কবি শুধু গতির জয়গানই গান নি বলাকা কাব্যে।

এ কাব্যের মহত্ত্ব আরো পরিব্যাপ্ত, আরো গভীর।

প্রলয়-সাগর পার হোয়ে নবযুগের নূতন সৃষ্টির তীরে নবজীবনের বিজয়কেতন তিনি তুলে ধরেছেন এইখানে। কবি লিখলেন:

দূর হ'তে কি শুনিস
মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন...

বলেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এই কাব্যের আবির্ভাব। দূর থেকে সেই যুদ্ধের গর্জন শোনা যাচ্ছে প্রতিদিনের খবরের কাগজে। য়ুরোপে চলেছে প্রাণঘাতী ধ্বংসলীলা, আর এখানে, ভারতবর্ষে বসে আমরা উদাসীন ভাবে তারই আলোচনা করে জমাচ্ছি সকাল-সন্ধ্যের চায়ের আসর। কবি তাই আমাদের আহ্বান করে বললেন, প্রত্যক্ষ করো যুদ্ধের এই নগ্ন ও বাস্তব রূপ, অনুভব করো সেখানকার রক্তারক্তি আর কান্না। কবি প্রসারিত করে দিলেন তাঁর কল্পনাকে। বেদনা-বিক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি যেন দেখতে পেলেন, তরল আগুনের তরঙ্গ ছুটে চলেছে, বিষবাষ্পে চারদিক আচ্ছন্ন, আকাশ থেকে হচ্ছে বোমা বৃষ্টি, মাটির ওপর থেকে বিমানভেদী কামানের গোলা—আকাশে ও পৃথিবীতে সে এক বীভৎস মরণ আলিঙ্গন। মানবসভ্যতা তবে কি সত্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে?

না। কবি বললেন—এরই মধ্যে পথ করে মানব-ইতিহাসের তরীকে নিয়ে যেতে হবে নূতন যুগের তীরে। তিনি যেন শুনতে পেলেন মানব-ইতিহাসের কর্ণধারের ডাক। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরাই পারেন সে-ডাকের মর্ম অনুধাবন করতে। তাই তো কবি বললেন, 'মানবইতিহাসের বিধাতাপুরুষ বলছেন, আরাম ও ঐশ্বর্যের ঘাটের সঙ্গে বাঁধন এবারের মতো চুকিয়ে দাও। সুখের ডাঙায় বসে বসে পুরানো যুগের সব মতামত ও আচার বিচার নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না, নতুন সত্যের জগতে গিয়ে এখন লেন-দেন বেচা-কেনা করতে হবে।' যুগচেতনাকে এমন ভাবে কাব্যে প্রতিফলিত করা সেদিন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের মৃত্যুঅগ্নির সাগর পার হোয়ে তরী বেয়ে নূতন যুগে পৌঁছতে হবে—এ বার্তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে দিতে পারেন?

নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে আলোকের আবাহন মন্ত্ররচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। প্রভাত এসেছে, রাত নেই। তবু ঝড় দুর্যোগের পুঞ্জীভূত কালো মেঘের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে প্রভাতের আলো। দিগন্তে তুফানের ঢেউ গর্জিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। তারই মাঝে কাণ্ডারী হাঁকছেন: 'ঝড়তুফানে পাড়ি দাও—যাত্রা কর।' কী ভীষণ কথা! মা কাঁদছেন, স্ত্রী কাঁদছেন। চারদিকে বিচ্ছেদের হাহাকার, ঘরে ঘরে আরামের শয্যা শূন্য হোল। কাণ্ডারীর কঠিন হুকুম: 'যাত্রা কর যাত্রা কর, বন্দরের সময় শেষ হয়েছে।'

মৃত্যুসাগর পাড়ি দিয়ে তরী যাত্রা করলো।

প্রশ্ন নয়, তর্ক নয়—'দড়ি আঁকড়ে ধর, পাল টেনে রাখ। বাঁচ আর মর, তরী বেয়ে যেতেই হবে'। কোথায়? কোথায় লক্ষ্য তা জানেন কর্ণধার। তুফানের কণ্ঠে প্রচণ্ড ডাক এসেছে। শূন্যে শূন্যে শোনা যায় তারই গর্জন। নবজীবনের এই দারুণ দুঃখময় অভিসারের অন্ধকার-পথে শুধু শোনা যায় আজ মরণের গান—পৃথিবীর দুঃখ-বেদনার বিপুল কান্না। তবু এইসব ঠেলে তরী বেয়ে যেতেই হবে বুকে অন্তহীন আশা নিয়ে। জীবন দিয়ে বলতে হবে: 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।' পৃথিবীর সেই মহাদুর্য্যোগময় দিনে কবির কণ্ঠে আমরা শুনলাম পরম আশ্বাসের বাণী: 'মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ আজ দেবতার অমর মহিমার অধিকারী হবেই হবে।' অন্ধকারের শেষেই আছে প্রভাতের আলো। বলাকা সেই আলোকেরই বাণীদূত। এই কাব্যের উদয়াচলেই আভাসিত নবজীবনের অরুণালোক। এই কাব্যবীণার তারে তারে ঝঙ্কৃত নবযুগের দীপ্ত বাণী। এরই স্ফটিকপাত্রে বিধৃত কবির অন্তরের ধ্যানোপলব্ধি। বলাকা যুগান্তের পটে একটি অনির্বাণ আলোকবর্তিকা।

দশ

শুধ্ কল্পনার রাজ্যে বাস করেন নি রবীন্দ্রনাথ।

পিতার জমিদারির তদারক করেছেন, নিজে সংসারধর্ম প্রতিপালন করেছেন। তিনি ছিলেন কর্তব্যপর স্বামী, স্নেহশীল পিতা। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও মানুষ—সাধারণ মানুষের মতো সুখদুঃখ, স্নেহদয়া ও মমতার সুতীব্র অনুভূতি ছিল তাঁর। সংসারের সহস্র কর্তব্যের মধ্যে, সুখদুঃখ শান্তি উদ্বেগের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করেছেন। তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ি বহু গোষ্ঠিপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা নানা আদর্শে মানুষ হচ্ছে। কবির তখন পাঁচটি ছেলেমেয়ে—রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা আর শমীন্দ্রনাথ। মহর্ষি তখন বৃদ্ধ। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বতন্ত্র সংসার পাততে চাইলেন। শিলাইদহ থেকে স্ত্রীকে লিখলেন: 'আমি কলিকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।'

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সংসার পাতলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা করলেন ঘরেই। কুঠিবাড়িতেই তাদের জন্য খুললেন ছোট একটি স্কুল। তিন বছর কাটল। মেয়েরা বড় হচ্ছে, বিয়ের বয়স তাদের প্রায় হয়ে এলো। বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের এনট্রান্স পরীক্ষার সময়ও এসে গেল। কবি এবার স্থির করলেন শান্তিনিকেতনে এসে বাস করবেন। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও সেখানে থাকবেন। কলকাতায় এসে বড়ো মেয়ে বুটির বিয়ে দিলেন। নূতন করে শান্তিনিকেতনে সংসার পাতবেন বলে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে এলেন সেখানে। একটা নূতন বাড়ির পত্তন করলেন। ভেবেছিলেন শান্তিনিকেতনের এই নূতন বাড়িতে তাঁর ঘর-সংসার পাতবেন। কিন্তু

ভবিতব্য অন্যরূপ। এক বছরের মধ্যেই কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হোল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একচল্লিশ। রথীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর। মীরার বয়স দশ। ছোট ছেলে শমীন্দ্রের বয়স আট বছর।

স্ত্রীর মৃত্যু হোল। কবির সাশ্রুবেদনার ফল্গুধারা প্রবাহিত হোল নানা কবিতায়। শোক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন। মৃত্যুর রূপ প্রগাঢ় উপলব্ধির উদ্ভাসে দেখেছেন নানা ভাবে। কিন্তু বিচলিত হন নি কখনো। তিনি জানতেন—সংসার কর্মভূমি, কর্তব্যস্থল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেজমেয়ের অসুখ করল। কঠিন অসুখ—যক্ষ্মা। ভারাক্রান্তমনে পীড়িত মেয়েকে নিয়ে এলেন হাজারিবাগে। সেখান থেকে আলমোড়া। তারপর একদিন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র প্রবাসে কলেরায় মারা গেল। কবির মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। সেই আঘাতে তাঁর অন্তরের পিতৃস্নেহ যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়েরই স্নেহ লাভ করত। কবির অন্তরের সেই গভীর স্নেহ থেকে উৎসারিত 'শিশু' কাব্যটি তাই বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ। এই কাব্যটি রবীন্দ্রপ্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন। এই কাব্যে মাধুর্যরসের সঙ্গে মিলে রয়েছে এক রহস্যরস। সম্মুখে জগৎসংসার প্রসারিত, তার উপরে এক ক্ষুদ্র শিশু :

> জগৎ-পারাবারের তীরে
> ছেলেরা করে খেলা।

এই পরমরহস্যকে তাঁর অন্তরের অনুভূতি দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শিশুজগতের কথা এমন অবারিতভাবে আর কোনো কবি তুলে ধরতে পারেন নি ; শিশুমনের কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় আর কেউ রচনা করেন নি। বনস্পতির মতো উন্নত অত বড়ো প্রতিভা, সারা বিশ্বের সম্মানিত অত বড়ো একজন মনীষী, অথচ তাঁর সুন্দর সৌম্যমূর্তিখানি সব সময় ছিল শান্তিপূর্ণ আর আনন্দে ভরা। তাঁর কাছে ছেলেমেয়েদের

প্রবেশ ছিল অবারিত, তাঁর সঙ্গে তারা কথা বলতো একান্ত নিঃসংকোচে। কবির সঙ্গলাভ করে মন তাদের ভরে উঠতো মহা উল্লাসে। তাই তো কবির অন্তর এদের উদ্দেশে বলত :

ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি।
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।

সত্যি, রবীন্দ্রনাথ ছোটদের আনন্দ দিয়েছেন তাদেরই মতো হয়ে। সারা জগতের কবি তিনি—অথচ ছোটদের তিনি ছিলেন সবচেয়ে আপনজন। কত না আগ্রহের সঙ্গে তিনি অনুভব করেছেন শিশুদের মনের কথা, তাদের প্রাণের অনুভূতি আর তাদের মনের কথা বলবার জন্য কী আকুতিই না তাঁর ছিল।

ছেলে তার মা-কে জিজ্ঞাসা করল, মা, আমায় তুমি কোথায় পেয়েছ। মায়ের প্রাণের সকল কোমলতা মিশিয়ে কবি লিখলেন :

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি॥

মনে হয়, 'এই কাব্যে কবি যেন তাঁর ভগবৎ-উপলব্ধির দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শিশুতে তাঁর কেমন এক ছটা প্রত্যক্ষ করছেন—যেন প্রভাতসূর্যের কিরণ গাছের পাতা ফেঁকড়ির ফাঁকে-ফাঁকে তীক্ষ্ণ হয়ে এসে চোখে পড়ছে।' সমস্ত কাব্যখানির ভিতরে একটা চিরনবীন রহস্যের স্পর্শ, একটা চিরচঞ্চল প্রাণ যেন ঝলমল করছে। নিবিড় বাৎসল্যরস যেন উপচে পড়ছে এর প্রতিটি কবিতা থেকে :

তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে, রঙিন আঙিয়া!

পৃথিবীর সকল শিশুদের উদ্দেশে যে আশীর্বাদ কবি রেখে গেছেন এই কাব্যের স্বর্ণপাত্রে, তেমন প্রাণ-মাতানো আশীর্বাণী সারা বিশ্বেও খুঁজে পাওয়া যাবে না :

আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে?

তরুণ তনু শিশু তার নূতন আঁখি মেলে পৃথিবীর পানে চাইলো। তারপর সেই শিশু ধীরে ধীরে বড়ো হোল, কবিও রয়েছেন নানাভাবে তার সঙ্গে। মায়ের কথায় শিশুকে তিনি বলছেন :

আমার খোকা সকল কথা জানে!
কিন্তু তার এমন ভাষা,
কে বুঝে তার মানে!
মৌন থাকে সাধে?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কি আকুলতা?
তাকায় তাই বোবার মত
মায়ের মুখচাঁদে।

আবার কখনো বা খোকার মুখ দিয়ে বলছেন :

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি!

শিশু ও তার মা—সংসারের এই দুটি বিচিত্র হৃদয়ের মধ্যে এই যে অপূর্ব ভাবটি কবি সৃষ্টি করেছেন, তা চিরকালের। এই অপরূপ ভাবের মাঝখানে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—রয়েছেন তিনি বাংলার মায়েদের বুকে

কোলে চোখের পাতায় চিরন্তনভাবে মিশে শিশুটি হয়ে। শিশু-হৃদয়ের সকল মমতা, সকল ব্যাকুলতা দিয়ে তাই তো খোকা তার মায়ের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবার সময়ও বলছে :

তবে আমি যাই গো তবে যাই
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাক্‌বি যখন খোকা বলে
বল্‌ব আমি—নাই সে খোকা নাই!
মাগো যাই!

শিশু-মনের এমন সুন্দর প্রকাশ কাব্যে এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের দেখতেন ঠিক তাদেরই মন নিয়ে—তিনি যে ছিলেন চিরদিন তাদেরই সমবয়সী। তাই না তিনি বলেছেন : 'বিধাতার নিজের হাতে তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতেই ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়।' কী গদ্য, কী পদ্য, শিশুদের জন্য লিখবার অবকাশ পেলেই কবির মন আনন্দে নেচে উঠতো। সত্তর বছর বয়সেও তিনি বাংলার এক শিশুকে লিখছেন :

লিখতে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজো আমার হাতে।
... ...
নতুন চিকন অশথ পাতা
সেই কলমে আপনি নাচে
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

শিশুজগতকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন কবি কি করে? তাঁর

সুবিশাল কাব্য-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে কবির সেই শৈশবকল্পনার ভিত্তির ওপর। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যে শৈশবকল্পনার দ্বারা ওতপ্রোত। মনে পড়ে 'কড়ি-ও-কোমল'-এর সেই প্রাণ-মাতানো কবিতা দুটি—'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' আর 'সাতভাই চম্পা'। কবির শৈশবকল্পনার সার্থক প্রকাশ পাই এখানে। বাংলার শিশুদের মধু-উৎস ছেলেভুলানো ছড়া ও রূপকথা অমরতা লাভ করেছে এই দুটি কবিতায়। আবার 'চিত্রা' কাব্যের সেই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় দেখা দিয়েছে কবির বাৎসল্যদৃষ্টির নূতন দিগন্ত। শিশু-কাব্যের মর্মবাণীটি যেন আমরা এরই মধ্যে পাই। পত্নীর অকালমৃত্যু, মা-হারা শিশুপুত্রের মূক বেদনা, তারপর বালিকা মেয়ের প্রাণসংশয় অসুখ—ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনাগুলিই তো সেদিন কবিচিত্তে বাৎসল্য অনুভাবের দ্বার খুলে দিয়েছিল। তাইতো 'নিত্যকালের শিশুটির হাসিকান্নার দোতারা বাজিয়াছে তাঁর 'শিশু' কাব্যে। এখানে শিশুর মধ্যে বিশ্বরূপ না দেখে কবি নিখিল বিশ্বের মধ্যে শিশুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।'

শিশুমনের রহস্য অগাধ। সে-রহস্য তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা পৃথিবীর আর কোনো কবি কখনো করেন নি। 'মানবসংসারের গোকুলবৃন্দাবনে যাহার নূপুর ঝঙ্কারে চরাচরহৃদয় মুগ্ধ, বিশ্বসংসারের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাহার ধূলিমলিন বিরলবাস দেহচ্ছন্দে তপনশশিতারকার চক্ষু মন্ত্রার্পিত' —সেই চিরনবীন শিশুকে আমাদের মনের প্রাঙ্গণে শাশ্বতভাবে রেখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মা গিয়েছেন ও-পাড়ার দীঘিতে ঘট কাঁধে করে জল আনতে। সেই ফাঁকে ঘুমচোরা ঘরে ঢুকে খোকার ঘুম চুরি করে আকাশে উধাও হয়ে গেল। মা ফিরে এসে অবাক—দেখেন, তাঁর সেই ঘুমন্ত খোকা ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে। এ কী কাণ্ড, মা ভাবেন আর অমনি সেই ঘুমচোরার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার কল্পনা করতে থাকে মায়ের হৃদয় :

যাব আমি ভরা সাঁজে সেই বেণুবন মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বলে জোনাকি,

শুধাব মিনতি করে আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের কাছে জানাশোনা কি ?

শিশুর জগৎ বিচিত্র—কিছু বাস্তব আর কিছু কল্পনা মিশিয়ে তৈরি সে-জগৎ। তাই তো শিশুর মন বুঝতে পারে না সংস্কার-শৃঙ্খলের কী মানে। তাই তো সে তার মা-কে শুধায় ঃ

মনে কর্ না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্ না সন্ধ্যে হ'ল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ?

'শিশু' কাব্যের কতকগুলি কবিতার মধ্যে আছে কবির শৈশব-কল্পনার ছায়া। তিনি যেন নিজের অতীত শিশুরূপকে ফিরে পেয়েছেন। তাই তো কল্পনার সঙ্গে মিশেছে সংবেদনার স্পর্শ। এই অপূর্ব সংযোগই কাব্যখানিকে করেছে সুন্দর। যুগ আসবে, যুগ চলে যাবে, কিন্তু জগৎ-পারাবারের তীরে যে চিরন্তন শিশু, বালুকা দিয়ে ঘর বেঁধে ঝিনুক নিয়ে খেলা করবে, যে তার নিজের হাতে পাতার ভেলা তৈরি করে বিপুল নীল সলিলে তার সেই খেলার তরী ভাসাবে, যে-শিশু বলবে যে, সে ঢেউ হয়ে তার মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়বে—নিখিল বিশ্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই শিশুকেই রেখে গেছেন। রেখে গেছেন বাৎসল্যরসের এক অপরূপ আলেখ্য যার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে মানবপ্রকৃতির মর্মের কামনা আর নিখিল মাতৃহৃদয়ের বিশ্বরূপ।

এগারো

প্রেমের জলতরঙ্গ বাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য সুরে।

প্রেম এক নূতন ব্যঞ্জনা পেয়েছে তাঁর কাব্যে।

ফুলের মতো পূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে প্রেম কবির অন্তরে। তাইতো তিনি বলতে পেরেছেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জীবন ভোগে অসত্য নয়। তাহলে কালিদাস, বিদ্যাপতি, হাফিজ— এঁরা সব মিথ্যা হোয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপাসক। প্রেমিক ভিন্ন সার্থক সৌন্দর্য-উপলব্ধি কোথায়? 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ থেকে রবীন্দ্র-কাব্যকুঞ্জ পরিক্রম শুরু করে 'মহুয়া'-র মদির পরিবেশ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তবেই প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ সহজ হবে। এক অনাবিল সৌন্দর্য-স্নাত তাঁর প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা। সুরের তরঙ্গ উঠলো 'কড়ি ও কোমলে'। কমনীয় ছন্দ, সুনিয়ন্ত্রিত কবিকল্পনা আর রূপ শিল্পসঙ্গত। ভাষা তেমনি আশ্চর্য সুন্দর। সুন্দর এবং সমর্থ। অভিনবত্বের দ্যুতি যেন ঠিক্‌রে পড়ে এই কাব্যের সর্বাঙ্গে। এই কাব্যের পটভূমিতে আছে ঠাকুরপরিবারের একটি শোকাবহ ঘটনা— কবির বধূঠাকুরানী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর শোচনীয় মৃত্যু। এ-ঘটনা ঘটল কবির বয়স যখন বাইশ বছর চলছে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছে ঠিক তার পাঁচমাস আগে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে এবং অপ্রত্যাশিত কুলে। কবিবধূ মৃণালিনী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির এক অধস্তন কর্মচারীর মেয়ে। নিতান্তই বারো বছরের মেয়ে। মেয়ের নাম ছিল ভবতারিণী। তেমনি বিয়ের আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম ছিল কাদম্বিনী। ঠাকুর-বাড়িতে এ ধরনের নাম অচল; তাই

কাদম্বিনী হয়েছিল কাদম্বরী আর ভবতারিণী হোল মৃণালিনী। এই বালিকাবধূকে কবি নিজের হাতে 'মানুষ' করে বাড়ির অন্য সকলের সমতুল্য করে তুলেছিলেন। স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন যেমন স্নেহশীল তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। তাঁর বিয়ের 'পাঁচমাস পরে পরিবারের উপর দিয়ে একটা বড় রকম ঝড় বয়ে গেল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী-দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন। কারণ অজ্ঞাত। তবে শোনা যায়, পারিবারিক মনোমালিন্যই এর কারণ। রবীন্দ্রনাথের উপর এ-আঘাতটা প্রচণ্ডই হয়েছিল।' কনিষ্ঠ দেবরটি ছিলেন কাদম্বরী দেবীর পরম স্নেহের পাত্র—ডাকতেন তাকে 'রবি' বলে। রবীন্দ্রনাথও খুব শ্রদ্ধা করতেন তাঁর বৌঠাকুরানীকে। তাঁর মৃত্যুর পরে সারাজীবন ধরে তাঁর উদ্দেশে কত কবিতা ও গানই না তিনি লিখেছেন। 'এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন—তিনি কম প্রতিভাশালিনী নন।' 'পুষ্পাঞ্জলি' বৌঠাকুরানীর স্মরণে কবির প্রথম শোকাশ্রু। আকস্মিক শোকের এই রূঢ় আঘাত কবি-চিত্তে নিয়ে এলো পরিবর্তন। দূর করে দিল ছবি-ও-গানের অলস রসমাদকতা। কবি নিজেই লিখেছেন: 'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল।' প্রকৃতির পটে যেমন দিনের পর রাত দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তেও তেমনি তখন দেখা দিয়েছে হাসিকান্নার ছন্দ। এই নিদারুণ শোকাবেগ রসায়িত হোতে বিলম্ব হোল না। অন্তরের দুঃখবৈরাগ্য বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যে কারুণ্যের গৈরিক রঙ ধরে অশ্রুধৌত এক অপূর্ব মাধুর্য নিয়ে দেখা দিল। শোকের আঘাত কবি-চিত্তে এনে দিল একটি নির্লিপ্ততা, কমে গেল দৃষ্টির রস-আসক্তি—উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো সংসারের ছবি। কড়ি ও কোমলে প্রতিবিম্বিত কবির যৌবনস্বপ্নের সেই আশ্চর্য ছবি।

এক অপরূপ লিরিক সৌন্দর্য আর শুচি-সংহত ভাব ও ভাষা এই কাব্যের প্রত্যেকটি সনেটকে করেছে দীপ্যমান। নারীর দেহ-সৌন্দর্যকে কবি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য দিয়েছেন কয়েকটি কবিতায়। নারীর রূপ আর নারীর প্রেম—দুই-ই তীব্র উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। দেহের মধ্য দিয়ে দেহাতীতের জন্য ব্যাকুলতায় সে-প্রকাশ বড়ো সুন্দর :

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গতরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

কিন্তু কবি এইখানেই থামলেন না। বৈষ্ণব কবির যে সাহস হয় নি, এ-কালের রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন :

হৃদয় লুকায় আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন !

দেহতন্ময়তার জালে জড়িয়ে পড়েছে কবির চিত্ত সত্য, কিন্তু একান্ত রভস-বশংবদ প্রেম কবিচিত্তকে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারল না। মোহমুক্তির দুরাশায় কেঁদে ওঠে তাঁর হৃদয় :

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান !
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ !
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক অবসান !

কবিচিত্ত এখন জীবনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করে দুঃখসুখের যাত্রাপথে অগ্রসর হোতে উৎসুক। মনে জেগেছে ভোগবাসনার অতৃপ্তি আর ক্ষণকত্ব। উপলব্ধি করলেন কবি—ভোগবাসনা ত্যাগ করলেই প্রেয়কে পাওয়া যাবে। কবির হৃদয় এখন যেন পরম প্রেমের স্পর্শ-লাভের জন্য উদগ্রীব। আত্মজ্ঞান আভাসিত হয় তাঁর হৃদয়ে। বলেন :

আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে নাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া!

যৌবনস্বপ্নের অবসানে কবি এইবার পেলেন শাশ্বত প্রেমের সন্ধান।

'মানসী'র রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যবীণায় তুললেন অনন্ত প্রেমের সুরঝঙ্কার।

সে-প্রেমের দ্যুতিতে ভরে গেল রবীন্দ্রকাব্যকুঞ্জ।

বাক্-মাধুর্য আর শব্দ-নৈপুণ্যের সঙ্গে এইবার বিলসিত হোল ছন্দো-বৈচিত্র্য। সেই সঙ্গে মিলের অভিনবতাও। মানসীর কাব্যপ্রবাহে জলতরঙ্গ আরো সুমধুর। একদিকে, 'প্রকৃতিপটে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের স্রোতোরেখা আর অন্যদিকে কবিচিত্তে অশান্ত আবেগের অস্থিরতা' —'মানসী'-কাব্যের এই হোল বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা। বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য এ-কাব্যে আরো উজ্জ্বল, আরো প্রত্যক্ষ। হৃদয়াবেগ এখানে অনুরঞ্জিত করেছে কবির অনুভূতিকে। বেজে উঠলো জ্বালাহীন স্মৃতির মূর্ছনা। তার মধ্যে মূর্তিমতী মর্মের কামনা—মানসী প্রতিমা। বিরহিচিত্তের ব্যথার ঝঙ্কারে ভরে গেল কাব্যকুঞ্জ। 'মানসী'-র এক প্রান্তে রয়েছে অতীতজীবনের গোধূলি রাগ, অন্যপ্রান্তে 'নবযৌবনের নিরুদ্ধ কর্মউদ্দীপনার খর দীপ্তি।' কবিচিত্তের অধীর হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ধ্বনিত হয় নিপীড়িত ক্ষোভের বাণী ঃ

কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডী মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

কবির হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। জীবন আনন্দে আর ব্যথায় জটিল। কিন্তু দৃষ্টি বিপর্যস্ত নয়। তাই তো মানসী প্রতিমার চরণাঘাতে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য কবির হৃদয়ে সহস্র ধারায়। মরকত

হ্যুতির মতো সূক্ষ্ম অনুভূতির আলো অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে ঠিকরে পড়ছে এই কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলি থেকে। কবি কখনো বিরহে উদাস, কখনো তিনি শূন্যহৃদয় আবার কখনো বা তিনি সংশয়ের আবেগে অস্থির। আবার কখনো সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে কবি বলছেন :

বৃথা এ ক্রন্দন
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা !
... ...
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি
কোথা তুমি !

অনুভূতির এমন আগ্নেয় উচ্ছ্বাস শ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টির মধ্যেও বিরল। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা, সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার ইচ্ছা—সবই যেন এখানে গোমুখীর প্রবল স্রোতোধারার মতো বেদনাময় কবিহৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর ভিতরকার দুর্জয় শক্তিস্রোত নিজে থেকে এগিয়ে চলেছে :

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

মোট কথা, 'ভাবনা ও কামনা দুই মিলিয়া একটি অতৃপ্তি-অসন্তুষ্টির আস্তরণ রচনা করিয়াছে মানসী কাব্যে। অতৃপ্তি কবিচিত্তের দ্বন্দ্বে, অসন্তুষ্টি সমাজের চিন্তাহীন গতানুগতিকতায়। অতৃপ্তি-অসন্তুষ্টি ডুবিয়া গেল ভালবাসার দেহহীন সংবেদনায়, বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতিতে, স্মৃতির রোমন্থনে।' মানসী রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ধ্রুবতারা। নবযৌবনের প্রেমকল্পনাই মানসীপ্রতিমায় পরিণত। অন্তর্ভোগের এই অনুরণনের মধ্যেই আছে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের এক মহান্ আত্মপ্রকাশ। তাই তো তিনি বলেছেন :

অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস

সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি,
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ।

প্রেম ছাড়া সমস্ত জীবন অর্থহীন। কিন্তু সে-প্রেম ইন্দ্রিয়সম্ভোগের মধ্যে নেই। যখন

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

তখনই তো আমরা অনুভব করি অনন্তপ্রেমের রূপ আর তখনই তো আমরা অনুভব করি যে, দুটি নরনারীর প্রেমের মধ্যে সমস্ত নিখিলের প্রাণের প্রীতি ও বেদনা প্রকট হোয়ে ওঠে। কবির মানসীকাব্যে 'নরনারীর প্রীতির মধ্যে যে অনন্তকালের এবং বিশ্বভুবনের প্রীতি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে,' তার মর্মবাণী কবি এইভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

'এই যে উদার প্রেম যাহা মানুষের অন্তর হইতে আহৃত হইয়া সমস্ত প্রকৃতির আনন্দের সহিত একীভূত হইয়া প্রকৃতিকে ও মানুষকে এক করিয়া দেখে ইহা আমাদের দেশের সাহিত্যে একেবারে নূতন।' যে প্রেম আমাদের ললাটে এঁকে দেয় মহিমার শিখা, যাতে আলোকিত হয়ে ওঠে আমাদের অন্তর্লোক, যে প্রেমের মধ্যে শোনা যায় দূরদূরান্তের দেশ-বিদেশের ভাষায়, যুগযুগান্তরের দিবারাত্রির মিলন-বিরহের গাথা, যে প্রেমের মধ্যে ভেসে ওঠে ধ্যানরতা শকুন্তলার মুখ, পুরুরবার দুঃসহ বিরহগীত, তপস্বিনী মহাশ্বেতার অন্তরবেদনার রাগিণী, হর-পার্ব্বতীর মিলনের গীতি—সেই অক্ষয় যৌবনের অপরূপ লাবণ্যমহিমামণ্ডিত প্রেমের গানই আমরা শুনি মানসীর কাব্যালোকে।

হারুনা-মারু জাহাজে চড়ে কবি চলেছেন দক্ষিণ আমেরিকাভ্রমণে।

আহ্বান এসেছিল সেখানকার পেরু রাজ্য থেকে। ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরেই কবি ফরাসী দেশ হয়ে আর্জেনটিনাগামী জাহাজ ধরলেন। সঙ্গে এলম্‌হারস্ট চলেছেন সেক্রেটারি হয়ে। পেরুরাজ্যের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষেই পেরুবাসীরা ভারতের কবিকে সেই মহোৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনসপ্তাহ জাহাজে কাটিয়ে তিনি পৌঁছলেন আর্জেন্‌টিনার রাজধানী ও বন্দর বুয়েনোস এয়ারিসে। এবার জাহাজে তাঁর প্রচণ্ড কবিতাস্ফুর্তি দেখা দিল; এর আগে সমুদ্রবক্ষে জাহাজে কবির এমন কবিতাস্ফুর্তি দেখা যায় নি। কিন্তু হারুনামারু জাহাজে একদা সাগরের বুকে মেঘমেদুর পূর্বদিগন্তে ম্লান সূর্যালোকে অকস্মাৎ কবিচিত্তে জাগল সৃষ্টি প্রেরণা। সেই সৃষ্টির ফসল 'পূরবী' কাব্য। এখানেও ঘুরেফিরে গুঞ্জরিত হয়েছে কিশোর প্রেমস্মৃতি। কোন্ এক বিস্মৃত সন্ধ্যায় ভুবনডাঙার দিগন্তবিস্তৃত মাঠে তুচ্ছ আকন্দফুলের গন্ধ, পরীর কণ্ঠে বিনাভাষায় বাণী বাতাসে বাহিয়ে দিয়ে আনমনা কবিকে ক্ষণিকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, বহুকাল পরে সাগরপারের দেশে এসে আজ তাঁর সেই কথা মনে পড়ল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে :

মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে,
তারি মধ্যে বাজলো করুণ সুরে!

পূরবীর তানে মিশে আছে বিচ্ছেদব্যাকুলতার অশ্রুধারা। একদিকে আছে জীবনের ক্লান্তিভার, অন্যদিকে মনোবেদনা। বাঁশী তাই ইমনে বাজে। 'তাই আজ সুদূর বিদেশে পৃথিবীর অপরপৃষ্ঠে প্রবাসী কবিচিত্তে পরিচিত-অপরিচিত সামান্যতম বস্তু পরম মহার্ঘ্যতার দীপ্তিতে রমণীয় হইয়াছে।'

একদা যৌবনসাধনার দিনে কবির চিত্ত ছিল জীবনরসে উপচীয়মান। বসুন্ধরাকে তিনি সেদিন কল্পনা করেছিলেন আদিজননীরূপে। বসুন্ধরার বিরাট প্রাণের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন নিজের হৃৎস্পন্দন। কিন্তু আজ আর সে ভাব নয়। কবিচিত্ত এখন আর ধরণীর একদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ব্যেপেছে। ধরণী এখন আর মাতৃরূপিণী নয়—সে

পিতৃগৃহ-প্রবাসিনী বিরহিনী বধূ। প্রিয়প্রেমলিপির উত্তর কিছুতেই সে মনের মতো করে লিখতে পারছে না। সেই ধরণীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন কবি সমুদ্রদোলায় দুলতে দুলতে :

তোমারি মনের কথা আমারি মনের কথা টানে
চাও মোর পানে।

কিন্তু মুক্তির আনন্দই যেন 'পূরবী'-তে বেশি করে সাড়া জাগিয়েছে কবির চিত্তে। পরিপূর্ণতার সুধাপানের জন্য তিনি ব্যগ্র ; তাঁর কবিসত্তার গান চিরন্তনশেষের সুরে একতানে মিলে যেতে চায় বিশ্বনাটের তালে :

নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।
... ...
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে হে চির-বাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা, –
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

শৃণন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—ভারতের ঋষিকণ্ঠে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল এই বাণী। পূরবীতে আছে সেই উপলব্ধি, আছে জীবনের জয়গান :

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।

ষাটের কোঠায় পা দিয়ে পূরবীতে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি

এ যেন চিরসুন্দরের সামগান। মহিমাময় কবিকল্পনা আর অপূর্ব ছন্দস্পন্দ সমন্বিত হয়েছে এই কাব্যের স্ফটিক আধারে।

নারী-বন্দনা ধ্বনিত হয়েছে মহুয়া-কাব্যে। নারীপ্রকৃতির মাধুর্য আর লাবণ্য মিশে আছে এখানে বিচিত্রভাবে। 'মহুয়া' কবির অপরূপ সৃষ্টি। কান্তাপ্রেমের এমন প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের অন্য কোথাও নেই। এমন স্নিগ্ধ, নম্র আর কমনীয় কবিতাও বুঝি তিনি এর আগে আর কখনো রচনা করেন নি। 'মহুয়া' গীতিকাব্য। ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। কবি নিজেই বলেছেন, এই কাব্যে প্রণয়ের প্রসাধন কলা মুখ্য। কবি তাঁর এই অপরূপ কাব্যখানির পাঠ-পরিচয়ে লিখেছেন: 'প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, গল্প, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য।'

সত্যই মহুয়া মায়ালোকের কাব্য। এতে আছে প্রেমের অন্তরাস্বাদ। এতে পাই কবির পরিণত মনের বাসন্তিক স্পর্শ। প্রেম এখানে মৃত্যুঞ্জয়রূপে আবির্ভূত:

> ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু
> রুদ্র-বহ্নি হতে লহ জলদর্চি তনু।
>
> ... ...
>
> মৃত্যু হতে জাগ, পুষ্পধনু
> হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু॥

অগ্নি-উৎসের প্রবাহকে আলিঙ্গন করে, তার দুঃসহ সুন্দর দুর্দাম বেগে প্রেম তার তেজোময় স্বরূপে এখানে আবির্ভূত। নির্দয় নবযৌবন আসছে ভাঙনের মহারথে চড়ে। সে আসছে চিরন্তনের চঞ্চলতায় প্রান্তরে পর্বতের লতাগুল্মকে থর্‌থর্ করে কাঁপিয়ে আসছে। পাতায় পাতায়

ঘোষিত তার বার্তা। পলাশের আরতিপত্রে জ্বলছে তার রক্ত প্রদীপ। ডালিমের রক্তিম রাগে, মাধবিকার সুরভিসোহাগে ফুটে উঠেছে তার লাবণ্য। বকুল এনেছে পুষ্পোপহার, শিমূল রক্তবাস। আকাশে বাতাসে উদ্‌ঘোষিত অপরিচিতার জয়-সঙ্গীত। এই নবযৌবনের নব বসন্তের প্রাণবন্যার মধ্যে, এই উদ্দাম বেগের ফেনিল উচ্ছাসের মধ্যে কবি সন্ধান করেছেন প্রেমের সত্যকে। বিশ্বগতির সঙ্গে কবিচিত্তের এই একতানতার মধ্যেই সার্থক মহুয়ার মর্মবাণী।

প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে যুগলপ্রাণের পদ্মাসন। সেখান থেকে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে প্রেমের বাণী। তাই-ই কবির চিত্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে প্রেমের আবেশ। তিনি বলছেন ঃ

প্রাণ-দেবতার মন্দিরের দ্বার
যাক্ রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

প্রেমের নূতন চেতনায় উদ্বোধিত কবিচিত্ত। তিনি অনুভব করছেন বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাঁকে একটি সীমাহীন প্রেমের প্রেরণায় আন্দোলিত করে নিয়ে চলেছে এক মহা অভিযানের পথে। প্রকৃতি এবং প্রেয়সী যেন এক হোয়ে গিয়েছে মহুয়াকাব্যে। রূপের রেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রসের লেখা। প্রকৃতি তাই প্রতিভাত রসস্বরূপে। প্রকৃতি বর্জন করলো তার বস্তুরূপের বস্তুতাকে। তাই তো কবিচিত্ত গেয়ে উঠলো ঃ

বস্তু চেয়ে সেই মায়া তো
সত্যতর
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন করো।

নব বসন্ত এলো। লতায় পাতায় ফুলে উচ্ছ্বসিত প্রভাতের স্বর্ণকূলে প্রেমজাগরণের বাণী হিল্লোল। নারীদেহের সৌন্দর্যের মধ্যেও

ঠিক তাই। প্রেমের ছন্দ মনের কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে। নারীর রূপ বাইরের জিনিস নয়, তা অন্তরের মূর্ত প্রকাশ। সৌন্দর্য পূজার সামগ্রী—তা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতেই ভেসে আসে। মহুয়ার প্রেমে কাম নেই, আছে একটি বিশুদ্ধ প্রেমজ্যোতির স্নিগ্ধ শিখাসঞ্চরণ। মহুয়ার প্রেম এককথায় প্রকৃতি-প্রেমেরই একটি রসনিষ্যন্দ। এ এক নূতন প্রেমচেতনা—প্রেমের এ এক নূতন জাগরণ, নূতন আস্বাদ। এ যেন নবীন রাগের নব সোহাগের রাগিণীতে হৃদয়বীণার তারে এক নূতন ঝঙ্কার। এ প্রেম প্রদীপ্ত। এ প্রেম নির্ভয়। 'মহুয়া'তে তাই একটি নূতন সুর বেজে উঠেছে :

আমরা দুজনে স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

মহুয়ার প্রেম বীরের প্রেম ; শৌর্যের দ্বারা তা মহিমান্বিত। মহুয়ার নারীও বীর্যবতী, সবলা। সে-নারী নিজের পথ নিজে চিনে নিতে চায় ; দুর্গমের দুর্গ থেকে সে চায় সাধনার ধন আহরণ করতে। দৈবাগত দিনের প্রত্যাশায় সে-নারী পথপ্রান্তে বসে থাকে না। সে-নারী বলে :

যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

পাতিব্রত্যের বিনম্র দীনতা নয়। দেহসৌখ্যের মিলন-সম্ভোগের হীনতার মধ্যে এ নারী তার মিলনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায় না। তার

রক্তে বাজে রুদ্রবীণা। মহুয়ার পুরুষও তেমনি নারীকে সেবা কক্ষে আহ্বান করে না; সে চায়:

তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উধ্বর্শিখা বিপুল বিশ্বাস।

মহুয়া-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমের বন্দনাই রচনা করেছেন যে প্রেম আমাদের চিত্তে জাগায় অভয় বাণী, যে-প্রেম মুক্ত করে প্রকাশ করে মর্মগত চিরসত্যকে—যে প্রেম আমাদের চিত্তকে তুলে ধরে মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে। আর যে প্রেম প্রেমিকের ললাটে এঁকে দেয় অমৃতের টিকা-- জীবনজয়রেখার শুভ্র তিলক। মৃত্যুপথে বিলীয়মানা নারী যখন বলে:

সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, 'সমস্ত মহুয়া কাব্যের মধ্যে নারীর যৌবন-বহ্নি, তাহার মদিররস, তাহার উদ্দাম আকর্ষণ, তাহার ধৈর্য গাম্ভীর্যের সহিত, তাহার আশ্রয়চ্ছায়ার সহিত, তাহার উর্ধ্বোন্নত মুক্তিচারী অনন্তের আহ্বানের সহিত, কেমন কঠিনে মধুরে মিলন ঘটিয়াছে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।' মহুয়ার পর্ণপুটে রবীন্দ্রনাথ নিঃশেষে ভরে দিয়েছেন নারীপ্রেমের সমগ্র অনুভব আর কল্পনা।

বারো

গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ।

মায়াময় স্বপ্নসুষমা আছে তাঁর গানে।

আছে রসের রূপপরিণতি।

সুরসৃষ্টিতেও তাঁর মৌলিকতা বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রনাথের গানের সুর জীবনে ও ভুবনে পরিব্যাপ্ত।

কবির অধ্যাত্মসাধনার নিগূঢ় প্রকাশ গানেই। বাণীর যেমন ঐশ্বর্য, সুরের তেমনি বৈচিত্র্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর যেন বাণীর মরাল-রূপ। প্রেম ও প্রকৃতি, তাঁর গানে সুরের রূপে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতি যেন তার সকল বর্ণ, সকল ছন্দ, সকল রূপ নিয়ে দেদীপ্যমান তাঁর গানের মধ্যে। যৌবনমধ্যাহ্ন যখন অতিক্রান্ত তখন থেকে গানে ও সুরে কবির কল্পনা, তাঁর চিন্তা ও ভাবনা যেন এক নূতন দিগন্তের পানে যাত্রা শুরু করলো। দিগ্‌বিদিক চমকে উঠলো তাঁর গানের দীপ্তিতে। সুরের প্লাবনে হারিয়ে গেল আমাদের জীবন, আমাদের পৃথিবী।

বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন বাউল।

সে-বাউল অবন্ধন-প্রিয় নয়। তার একতারায় ঝঙ্কার তোলে না কোনো নীরস তত্ত্ব। সে-বাউল অরূপের রূপের শিল্পী। সে-বাউল সুরের কাঙাল। সে সাঁঝ সকালে বনের পথে উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিদ্রাহারা রাতের গান সে সুরে বাঁধে আর কণ্ঠভরে সে নিয়ে আসে রজনীগন্ধা থেকে তান। এ এক বিচিত্র বাউল—সত্যান্বেষী অথচ শিল্পী। তাঁর হৃদয় রঙীন, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সূক্ষ্মভাবের ঝঙ্কার ওঠে এই বাউলের একতারায় ঃ

> আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
> আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥

এ বাউলের এই প্রত্যাশা। এর হৃদয় উধাও হয় দূর নক্ষত্রলোকের মধ্যে যেখানে অন্ধকার বীণায় বাজে আলোকের বন্দনা। এ-বাউল নিঃসঙ্গ রসিক। নিঃসঙ্গতার রসে তিনি কিন্তু নিমগ্ন নন।

আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।

এ গান একমাত্র নিঃসঙ্গ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই ঝঙ্কৃত হতে পারে। নিঃসঙ্গতার মাধুর্য বোধ করি পৃথিবীর আর কোনো কবির গানে এমনভাবে ব্যক্ত হয় নি যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাহিনী'র গানগুলিতে। কবি গাইছেন:

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে;
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে॥
... ...
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

অথবা আর একটি গান:

গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়ছে ঝরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে॥

এমন মধুর বিরহের প্রকাশ আর কোথায় আছে? কিন্তু এর মধ্যে তার চাইতে বেশী আছে কবির ব্যক্তিত্বেরই এক গূঢ় মধুর আস্বাদ।

যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চোখ মেলেছিলেন, সেই ঠাকুর-বাড়িতে আবহাওয়া ছিল সঙ্গীতময়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন: 'এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি

করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি …অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' ছেলেবেলায় যা পেয়েছিলেন তা সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকার নয়, গানের প্রতি আকর্ষণ। তারপর আমেদাবাদে শাহিবাগের সেই জনশূন্য প্রাসাদে—যার পাশ দিয়ে বয়ে যেত গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সবরমতী নদী—কবির জীবনে সঙ্গীতচর্চার দ্বিতীয় অধ্যায়।

'মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্ন কূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই শাহিবাগ-প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।' কবির সর্বপ্রথম গান :

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো॥
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়—
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

তারপর রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করে ব্যারিষ্টর হবার জন্য সমুদ্রের ওপারে যাত্রা করলেন। সেইখানেই আঠারো বছর বয়সে লিখলেন 'ভগ্নহৃদয়'। ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে কবি ভরতি হয়েছিলেন। বিলাতি সংগীতের সঙ্গে কবির এইখানে প্রথম পরিচয়। জীবনস্মৃতিতে

কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীত-শালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই···মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আরাম বোধ হইতে লাগিল—তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম।' তবু সেই বয়সেই কবির কাছে মনে হয়েছে 'য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন।...য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব-জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত।···আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত।'

এই অন্তরতর আর অনির্বচনীয় রহস্যের রূপ ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে। জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলা উচ্ছ্বসিত সেই বিতানের পথে পথে। আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতে সে বিতান-পথ মায়াময়। নভোনীলিমার নির্ণিমেষতা আর সুদূর দিগন্তরেখার অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস আছে সে-বিতানের সর্বত্র। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের পার্থক্য বিচার করে কবি যেখানে বলেছেন: 'আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা'—সেখানে সুরশিল্পী ও সঙ্গীতরচয়িতা রবীন্দ্র-নাথের মনের কথাই আমরা পাই। এই বোধ নিয়েই প্রবেশ করতে হবে কবির গীতবিতানে।

টমাস ম্যুরের 'আইরিশ মেলডীজ'-এর সঙ্গে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। কতবার তিনি অক্ষয় দত্তের কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি শুনেছেন। সেই গানের বইয়ের পাতায় পাতায় ছিল ছবি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করেছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর তাঁর মনের মধ্যে বাজত। তখন তিনি এর সুরগুলি শোনেন নি। বিলেতে এসে শুনলেন ও শিখলেন। মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল মনে হোল অনেকগুলো সুর, কিন্তু, কবির মনে হোল, 'তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।'

কবি ফিরলেন বিলেত থেকে। এখন বয়স উনিশ বছর। দেশে ফিরে তিনি স্বজনসমাজে গেয়ে শোনালেন বিলাতি গান। 'ঠাকুর-বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়; আসেন কলিকাতা শহরের খ্যাতনামা লোকেরা। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফেরার পর তারই বার্ষিক অধিবেশনে একটা নাটক-অভিনয়ের কথা হল। অনুরোধ করা হল রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখতে। সেই তাগিদে লেখা হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা'।' কবির প্রথম গীতিনাট্য। গীতিনাট্যের নূতন রূপ দেখা গেল বাল্মীকি-প্রতিভায়। গান এখানে সংলাপের প্রতিধ্বনি নয়; গান ও সংলাপ মিলেই জমেছে নাট্যরস। 'অভিনয় হল ঠাকুর-বাড়িতেই; রবীন্দ্রনাথ সাজলেন বাল্মীকি।···সেদিনকার উৎসবে বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি।' নবজগতের ছবি নূতন রবির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন সকলে। এরপর লিখলেন 'কালমৃগয়া'— রামায়ণের অন্ধমুনির পুত্রবধ এর নাট্যবিষয়। বাড়ির তেতালার ছাদে স্টেজ খাটিয়ে এর অভিনয় হয়েছিল। কথিত আছে, কালমৃগয়ার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। এ গীতিনাট্য দুটি আসলে ছিল গানের সূত্রে নাট্যের মালা; হৃদয়াবেগই ছিল প্রধান উপকরণ।

তারপর লিখলেন 'মায়ার খেলা'—গানের রসেই তখন কবির মন

এর পর কবি নীড় বাঁধলেন শান্তিনিকেতনে। তখন থেকেই 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাসে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। পদ্মাতীরে বাস ও পরিভ্রমণ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বহু বৈরাগী-বাউল-দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং বাউল গানের ও ভাটিয়ালি, শাড়ি প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের মর্মপরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসিবার পর কবিসত্তের দৃক্‌কোণ পরিবর্তিত হইল এবং বিরহদহন কবিচিত্তে সকরুণ বৈরাগ্যের রঙ ধরাইয়া দিল। একদা বোলপুরের পথে শোনা

গাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

বাউলগানের এই যে পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল, এখন তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ডালপালা মেলিল। বাউল-রীতির প্রভাব গানে ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা ও ভঙ্গির অন্তরঙ্গতা সঞ্চার করিল এবং সুরে খোলা হাওয়ার অকারণ উদ্দাম হর্ষ জাগাইল।'

এরপর থেকেই কবির গীতবিতানে নেমে এলো বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির সহস্রধারা। বাংলার কীর্তনগানের প্রবাহও এসে মিলেছে সেখানে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য আর গীতালি যে অসামান্য আবেদন নিয়ে দেখা দিয়েছিল পাঠকদের সামনে, তার মধ্যে ছিল এই কীর্তন আর বাউলের যুক্ত প্রভাব। গীতাঞ্জলির গানের ভাষা সোজা, ভাব ভক্তিনম্র, সুর সহজ এবং মর্মস্পর্শী। এর আবেদনও সর্বলৌকিক ও সর্বকালিক। গীতিমাল্যে কবি আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন—ভক্তিনম্রতার স্পর্শ এখানে মিলিয়ে এসেছে, তার বদলে দেখা দিয়েছে সুরের যাদু। গীতিমাল্যর গান তাই সমৃদ্ধতর। গীতালি একেবারেই সুরমাধুর্যে ভরা গানের ডালি।

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।

এখানে ভাব-ভাষা-তাল-চাল সবই যেন দূরের বাঁশির ডাকে উচ্চকিত।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য আস্বাদ করবার জিনিস। চিন্তাধারা হয়ত সুপরিচিত, কিন্তু নূতন প্রকাশভঙ্গিমার জন্য এ কত নূতন ঃ

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে-জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না তাকে ॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশপুরে
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে
মাটি পায় না তাকে।

ঋতুর সমারোহ যদি উপলব্ধি করতে হয় হৃদয়মন দিয়ে তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে সে-আশা চরিতার্থ হবে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য ঋতুর বর্ণনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। গানের ভিতর দিয়ে কবি যেখানে ঋতু-বর্ণনা করেছেন তার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। কী নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আর কী সুন্দরই বা বর্ণন-ভঙ্গী। ঋতুর বহিরঙ্গ বর্ণনা নেই তাঁর গানে। কবির মনের উপর ঋতুর বিভিন্ন রূপের ছায়াপাতের আলিম্পন কিভাবে এঁকে গিয়েছে, গানে তাই তিনি প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে ঋতুর বিভিন্ন ভাবটিও ফুটেছে সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের গানে নিদাঘের এই রূপটি আমরা পাই ঃ

হে তাপস তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥
তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥

অথবা,

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা
খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা ॥

যদি ঝরে পড়ে পড়ুক পাতা
ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা
যাক জনহীন পথে পথে মরীচিকা-জাল ফেলা॥

এমন করে আর কোন্ গান আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে? ঋতুর ভাববৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য কবি এইসব গানে প্রয়োগ করেছেন এক নূতন ধরণের ছন্দোগতি—তাও লক্ষণীয়। নিদাঘের দাহনে ধরণী যখন অসহায় তখন এলো কালবৈশাখীর হঠাৎ প্রচুর বর্ষণ। সে-ছবিকে কবি ফুটিয়ে তুললেন এই গানে:

পূব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশী॥
সহসা তাই কোথা হতে
কুলুকুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসি॥

এরপরেই বর্ষার বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন। বর্ষা আরম্ভ হতে দেরী আছে। সবেমাত্র রসপুষ্ট গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে বাতাসের বেগে ভেসে যাচ্ছে মেঘ। কবির গানে ফুটল তার অপরূপ ছবি:

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায়
আয় আয় আয়।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
যাই যাই যাই।

বর্ষার সূচনায় মেঘের'পরে মেঘ জমেছে আকাশে। জলভরা সেই কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের চমক। কী তার মোহন মূর্তি:

কাঁপিছে দেহলতা থর থর
চোখের জলে আঁখি ভর ভর

দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া
বাদল নিশীথেরি ঝর ঝর
তোমার আঁখি পরে ভর ভর।

বর্ষার সমাগমে শুরু হোল অশ্রান্ত বর্ষণ। সারাদিন ধরে বৃষ্টি ঝরছে। সে-ছবিও আঁকা হয়ে গেল কবির গানে অপূর্ব বর্ণসম্পাতে :

আজ আকাশের মনের কথা ঝর ঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিঘির কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে॥

বর্ষা এসেছে যেন বাউলের বেশে, মাথায় তার ঘন মেঘের জটা, হাতে একতারা। সেই বাউলকে স্বাগত জানিয়ে কবি গাইলেন :

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা
সারা বেলা ধরে ঝর ঝর ঝর ধারা
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা॥

ক্রমে বর্ষা প্রবল রূপ ধারণ করল। কবি সে-রূপেরও ছবি আঁকলেন 'কেতকী'র কয়েকটি গানে :

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে
সূর্য হারায়, হারায় তারা
আঁধারে পথ হয়-যে হারা
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

এই অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ রাতে কবির আঁখিপাতে ঘুম নেই। সেই

বর্ষণ মুখর তিমিরাবৃত রজনীতে তিনি জোড়হাতে জেগে আছেন। অন্তরে তাঁর উদ্বেলিত অসীম বিরহ। সেই বিরহের বাণীরূপ ফুটল এই নিবেদনের মধ্যে ঃ

দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো!
প্রভু কর দয়া দেহ দেখা দুখরাতে।

'নিশীথ রাতের বাদল ধারা'—গানটির ব্যঞ্জনার মধ্যে যে সূক্ষ্মতর অনুভূতি—তার মধ্যে রয়েছে নিশীথরাত্রির স্তব্ধগম্ভীর ভাবকে অতিক্রম করে কবির আত্মার গোপন অভিসার ও মিলনের অপূর্ব আকুতি। ভাব তরঙ্গের মধ্যে কবি ডুব দিয়েছেন এখানে। সেই অনুভূতির অনুরণন আছে এই অপূর্ব গানটির চরণে চরণে।

দীর্ঘ বর্ষাযাপনের পরে শরৎ-বধূর প্রসন্ন নয়ন-উন্মীলনের ছবিটি বড়ো সুন্দর। শরতের শিশির আর রৌদ্রের ঐশ্বর্য 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' গানটিতে চমৎকার রূপলাভ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ফুটেছে বসন্তের রূপ-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের গানে। পৌষের পাতা-ঝরা শীর্ণ শাখায় বাজল নব বসন্তের আগমনী। তার প্রতিধ্বনি উঠল কবির হৃদয়ে। ক্ষ্যাপা হাওয়ার আকুল সুরে তিনি গাইলেন বসন্তের ঝরা-পাতার গান। সেই গানের মধ্যে আছে বেদনা-কাতর তৃপ্তির আভা। বসন্তের বহু রূপ রূপায়িত হয়েছে তাঁর গানে। বসন্তের রঙান ফুলের উৎসব দেখে মুগ্ধ হোল কবিচিত্ত। তিনি গাইলেন ঃ

কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানি না-যে, জানি না-যে।

আর ফাল্গুন-পূর্ণিমায় তিনি গাইলেন ঃ

ভাঙল হাসির বাঁধ
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।

এমনি কত মুহূর্ত অপরূপ হয়ে আছে কবির গীতমালঞ্চে। সে-মালঞ্চের কত সুষমা, কত লাবণ্য আর কী নিগূঢ় সৌন্দর্য। এই আলো রবিরই আলো। সুর-তাল-পদের বাঁধুনিতে, বাণীর লাবণ্যে, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় এমন গান পৃথিবীতে আর কোন্ কবি রচনা করতে পেরেছেন? সঙ্গীতের এমন শিল্পময় রূপ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো কল্পনায় সম্ভব নয়। তাঁর গানের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাই আবেদন, গানে নিবেদন। সে-নিবেদন যেন নিস্তরঙ্গ জলে একরাশি প্রস্ফুটিত কুমুদ। স্নিগ্ধ, আত্মসমর্পণে সমাহিত। কবি রবীন্দ্রনাথকে তাই অতিক্রম করে গিয়েছেন গীতকার রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর গীতবিতানে প্রকটিত নূতনতর রসমহিমা। তাঁর প্রাণের ধারাস্রোত অন্তরের গীতপ্রবাহে মিলিত হয়ে অনন্তের সাগরের দিকে চলেছে। তাঁর কবিতায় আছে যুক্তবেণীপ্রবাহ, গানে সেই প্রবাহের সাগরসঙ্গম। কবি নিজেই বলেছেন, 'আমার কবিতা বাহিরের নাটশালায়, গান অন্তরের অন্তঃপুরে।' এই প্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভা।

তেরো

দিগন্ত প্রসারিত ভুবনডাঙার মাঠে শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এরই শান্ত পরিবেশে মহর্ষিদেব একদিন পেতে-ছিলেন তাঁর ধ্যানের আসন আর এইখানেই বালক-রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনায় প্রথম হাতেখড়ি। একদা সেই জনশূন্য মাঠে দুটি ছাতিমগাছের তলায় নির্জন সাধনায় মগ্ন মহর্ষিদেব খুঁজেছিলেন প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। এইখানেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি কাটিয়েছেন ঈশ্বরের উপাসনা করে। দেবেন্দ্রনাথ এখানে যে সাধনার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে শান্তিনিকেতনের সেই রুক্ষ মরুপ্রান্তর আজ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। কবির জীবনের সমস্ত সাধ ও সাধনা এই পুণ্যতীর্থকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। পিতার কল্পনাকে রূপ দিলেন পুত্র। দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এর বেশি তখন কিছু হয় নি। ১৩০৮, ৭ই পৌষ। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্যালয়ের ভার নিয়ে এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ছয়টি ছাত্র নিয়ে শুরু হয় এর কাজ। এই আশ্রমের ইতিহাস কবি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সারবাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূবদিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও বা তাল, কোথাও বা জাম, কোথাও বা ঝাউ। ইতস্ততঃ গুটিকয়েক নারিকেল। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি

নিরলংকৃত বেদী; তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে-মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তরদিকে আমলকী বনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারি সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদম গাছের ছায়ায়। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত আর জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহু-কালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। চারদিক বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধতা।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার। ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সে দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে। এই শান্ত জনবিরল শাল বাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছেব তলায়।'

প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি ছিল কবির প্রাণ। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কবি দেখেছিলেন বিস্মৃত এই তপোবনের চিত্র। সে-চিত্র কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানস-মূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। ভোগৈশ্বর্য জালে বিজড়িত এই তামসিক যুগে তপোবনের উপকরণ বিরল শান্ত সুন্দর আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না - তারই একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কল্পনা-বিলাসী কবিমাত্র তিনি যে নন, তাঁর এই দুঃসাহসিক প্রয়াসই তার প্রমাণ। কবি এখানে একাধারে কর্মী, এবং আচার্য। এ যেন আরেক রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আছে রবীন্দ্রমানসের নিগূঢ় পরিচয়। সে-পরিচয় না জানলে রবির আলোর সম্পূর্ণ স্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হব। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন কবি। তিনি নিজেই পড়াতেন ছাত্র-ছাত্রীদের আর

নিজেই সব দেখাশুনা করতেন। কবি এদের খেলারও সঙ্গী ছিলেন। ছাত্রদের পরিচর্যার ভার ছিল কবিপত্নীর উপর। তিনি নিজের হাতে রেঁধে দিনের পর দিন সকলকে খাইয়েছেন। এই বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠার এক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম প্রথম ছাত্র ছিল কয়েকটি মাত্র। ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা বেড়ে চললো। তারপর দশ-পনের বছরের মধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে শত শত ছাত্র এলো এইখানে। প্রাচীন ভারতের তপোবন যেন এই বিংশ শতাব্দীতে সেখানে গড়ে উঠলো। খেলাধূলো আর গল্প গানের ভিতর দিয়ে লেখাপড়া—এ এক নূতন পরীক্ষা বৈকি। ছেলেরা উন্মুক্ত মাঠে ছুটোপুটি করে বেড়ায়, গাছের ছায়ায় বসে লেখাপড়া করে। শিক্ষকদের সঙ্গে তারা মেশে স্বচ্ছন্দে। শান্তিনিকেতনে এই অবাধ আনন্দের ছবি অক্ষয় হয়ে আছে কবির একটি গানে। সে-গানটি এই ঃ

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন ॥
তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন ॥
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীলগগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন ॥

শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া ছাত্রদের সাহিত্যের দিকে টেনে নিয়ে যেত, লেখাপড়ার সঙ্গে চলতো সাহিত্যচর্চা, সংগীত-নৃত্য আর আবৃত্তি-অভিনয়। সাহিত্যসভা ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জীবনের একটি অঙ্গ। ফুল লতাপাতা দিয়ে সভা সাজিয়ে ছেলেরা নিজেদের রচনা

পড়ত, নূতন-শেখা গান গাইত। আশ্রমের বাগানে ফুল লতাপাতার অভাব ছিল না। কবির কাব্যমালঞ্চের চারদিকে সেদিন ঘিরে থাকত এই ছেলেরা—এদের মধ্যে অনেকে আবার কবিতাও রচনা করত। কবি দিতেন তাদের উৎসাহ। সতেরো বছর পরে শান্তিনিকেতনের সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিণত হোল বিশ্বভারতীতে। এই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন কত জ্ঞানী এবং গুণী লোক—তাঁরা সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে। এঁদের অনেকেই আবার দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন আশ্রমের কাজে। এমনিভাবেই নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন—আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠন কার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। ছেলেদের দেহে মনে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগিয়ে দিয়ে নূতন করে তাদের গড়তে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আশ্রমে ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে শুধু যে খেলায়ধূলায় নানারকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, গানের রাস্তা দিয়ে কবি নিয়ে গেছেন তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যকে সম্ভব ও স্বাভাবিক করে তোলাই ছিল শান্তিনিকেতনের শিক্ষার প্রধান আদর্শ।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের একটি মহাকাব্য।

তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টির মতন কবি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিদিনের চিন্তা, প্রতিদিনের কল্পনা আর উদ্যম দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই বিশ্বভারতী। এই বিশ্বভারতীর একটি অঙ্গ শ্রীনিকেতন। ১৯২৮-এর মাঘে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য ছেলেদের হাতেকলমে কাজ শেখানো। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে করে অকর্মণ্য; আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা মস্ত বড়ো ত্রুটি এই যে, পুঁথির বাইরে যেসব দরকারী জিনিস আছে, সেসবের দিকে আমাদের আগ্রহ যেন একেবারেই নেই। শ্রীনিকেতনে কবি শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ শ্রীনিকেতনে ছেলেদের

হাতে-কলমে শেখানো হয়। পল্লী-বাংলার মর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন কবি। শুধু কবিতা রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বাংলার প্রাণ তার গ্রাম। সেই গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি। বুঝেছেন বাংলা দেশকে বাঁচতে হলে গ্রামগুলিকে বাঁচাতে হবে। কেমন করে তা হবে, তারই পরীক্ষা তিনি করেছেন এই শ্রীনিকেতনে। পল্লীর গৃহস্থ জীবনের কল্যাণ সাধনই শ্রীনিকেতনের ভিত্তি।

ছোটোখাটো একটি স্কুলকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনা ও কর্মের প্রভাবে পরিণত করলেন বিপুল বিশ্বভারতীতে। শুষ্ক নীরস মরুর বুকে গড়ে তুললেন প্রকৃতির লীলানিকেতন—শান্তিনিকেতন। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত দেশ থেকে এখানে তিনি আকর্ষণ করে এনেছেন কত জ্ঞানী-গুণী এবং মনীষিদের। এইখানেই প্রতিদিন পূর্বগগনের প্রভাত-রবির কিরণ ছটা এসে পড়তো আশ্রম রবির তেজোপূর্ণ মুখে। সকল ঋতুর উৎসব প্রবর্তন রবীন্দ্র প্রতিভার আর একটি দান। এইসব ঋতুকে মূর্তি-মন্ত করে তিনি রচনা করতেন নাটক, ঋতু উৎসবের সময় তার অভিনয় হোত। কী বৈচিত্র্যপূর্ণ আর প্রাণবন্ত সে সব উৎসব! এমনিভাবে কর্মের সঙ্গে আনন্দের, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সাধনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ আজীবন। দেশের কল্যাণ ছিল এর মূল উৎস। কবি নিজেই বলেছেন: 'দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে। দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি যে পৃথিবীর একজন সেরা কর্মী ছিলেন, তারই

স্বাক্ষর আছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গে। তাঁর সারা জীবনের সাধনা মূর্ত হয়ে আছে এইখানে। তাঁর শান্তি-নিকেতনের ভাবধারার সঙ্গে মিলেছে শ্রীনিকেতনের কর্মধারা—বিশ্ব-ভারতীতে তারই মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঋষিরূপে প্রাচীন ভারতের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে ফিরিয়ে এনেছেন নিজের সাধন বলে, আর প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাকে নূতন রূপ ও ভাবে বিশ্বভারতীর মধ্যে। সমস্ত বিশ্বকে এখানে নীড় করেছেন তিনি। বলেছেন: 'সমস্ত বিশ্ব এখানে এক-নীড় হবে, তাহলে মানুষের মধ্যে সেই অসীমকে, সেই ভূমাকে উপলব্ধি করবো।' কবি তাই করেছেন—মহামানবের মিলন-ক্ষেত্র রচনা করেছেন ভুবনডাঙার মাঠে। বিশ্বভারতীকে বিশ্বের আকর্ষণের বস্তু করে তুলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম-প্রতিভার একটা বড়ো রকমের পরিচয় দিয়ে গেছেন। কবির শান্তিনিকেতন ইতিহাসের বুকে একটি গৌরবস্তম্ভ--তাঁর প্রতিভার অক্ষয় সৃষ্টি। সাধনার সর্বোত্তম সিদ্ধি।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ একাধারে কর্মী ও ঋষি। সেই তাঁর ঋষিত্বের কথা এইবার বলি। এইখানেই প্রত্যক্ষ করা যায় প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনচ্ছায় শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত শান্ত সমাহিত চিত্ত সৌম্য মূর্তি এক ঋষিকে। নানা সময়ে নানা উৎসবকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা বলতেন, সে তো যেমন-তেমন কথা নয়, সে তাঁর অন্তরের বাণী। জ্ঞানে শুভ্র, অনুভূতিতে উজ্জ্বল আর অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতায় প্রদীপ্ত। নব-ভারতের নূতন উপনিষদ্ সেই সব বাণী। 'শান্তিনিকতন' গ্রন্থের স্বর্ণপাত্রে বিধৃত সেইসব মহৎ বাণী যেন কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিঃশ্বাস। যৌবনে নিভৃতে যে-কবি ছিলেন পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন, সেই রবীন্দ্রনাথই একদিন শান্তিনিকেতনের উপকরণবিরল শান্তসুন্দর পরিবেশের মধ্যে ফুটে উঠলেন ঋষি রূপে। ভাববিলীন তপোবন চাইল তাঁর কাছ থেকে বাণীরূপ নিতে। রূপে রূপে অপরূপ হয়ে উঠেছে সেই বাণী কবির অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত ভাব-গম্ভীর

বিচিত্র চেতনার মধ্যে। কত ভাবেই না তিনি ব্যক্ত করেছেন শান্তি-নিকেতনের মর্মকথা। প্রতি বছর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে উৎসব হয়। অতি স্মরণীয় এই অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে বিজড়িত মহর্ষির পুণ্যস্মৃতি। 'একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল,, এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন।'

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে এই দিনটির মহিমা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে : 'এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। এই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন।...এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই দীক্ষার যে কত বড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে ? ...সেই যে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু, সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে ?...এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে —সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তা হলে ধন্য হব।...সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষাব দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন।'

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথের মহত্তম বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবার জিনিস, হেলায়-ফেলায় নেবার ধন নয়। তার পাতায় পাতায় আছে এমন দুর্লভ চিন্তার মণি-মাণিক্য যা আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করতে পারে। তিনি বলেছেন, এ জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে—নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য উপাসনা করতেন। কলরব মুখরিত এই মানুষের সংসারে থেকেই,

নির্জন অরণ্যে গিয়ে নয়। মানুষকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখতেন? বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের থাকবে সম্পূর্ণ ঐক্য আর বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ চলবে এক তানে, এক তালে। তাকে হতে হবে নক্ষত্রের মত নিঃশব্দ আর বনস্পতির মত নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মমুহূর্তের যে শান্তি, যে স্তব্ধতা, সেই রকম হবে মানুষের স্বভাব। সকল মানুষের মধ্যেই থাকবে বাণীর মিল, সুরের মিল। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল এই মানুষ। ঋষিরূপে তাই তিনি বলেছেন: 'ভগবান ওই যে অহঙ্কারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত, সেই তাপে তপ্ত, আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে।... কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা।...কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে, এই চেষ্টায়, এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত রয়েছে।'

একদা মহর্ষিদেব তেপান্তরের মাঠে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মনের পটভূমিতে ছিল ভারতবর্ষের তপোবন। একবার শান্তি-নিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই আশ্রম এই তপোবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন: 'এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি 'ঈশানে ভূতভব্যস্য' তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ

স্থাপন করেছে এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে। শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্যসাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এলে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এ সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব।'

রবীন্দ্রনাথ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন যে শান্তিনিকেতনের তপোবনে মহর্ষির জীবনের প্রভাব আপনি এসে পড়েছে। 'এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিকীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ...এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চলছে, সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে!...জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এই যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্য লীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না?...প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করা।'

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ যথার্থই ঋষি। সেই ঋষির আত্মার দীপ্তি আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মতই ছড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনের সর্বত্র। এখানকার শূন্যপ্রান্তরের পটের উপরে কবি ফলিয়ে তুলেছেন রঙের পর রঙ, প্রাণের পর প্রাণ। তাঁর চিত্তের প্রগাঢ়ভাবের সুস্নিগ্ধ অঞ্জন নিবিড় করে মাখানো এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে। এখানেই পরিব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনপূর্ণ বাণী।

চৌদ্দ

দেখতে দেখতে কালচক্রের আবর্তনে কবির জীবনের সত্তর বৎসর পূর্ণ হোল।

রবি এখন অস্তাচলগামী। কিন্তু নবারুণের বিভা তাঁর সর্বাঙ্গে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর কর্মে।

কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তাঁর স্বদেশবাসী। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হোলে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন। এবার সকল শ্রেণীর লোকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। বিজয়ী বীরের মতো তিনি বিশ্বজয় করে এসেছেন, একবার নয়, বারো বার। ভারতের মহত্তম আদর্শের পতাকাকে একাকী স্কন্ধে বহন করে নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন তিনি সমগ্র পৃথিবী। তাঁর গৌরবে বাঙালী গৌরবান্বিত—বিশ্বের দরবারে ভারত সম্মানিত। তাইতো 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন হোল ১৩৩৮-এর পৌষ মাসে।

সংবর্ধনার এমন আয়োজন আর কখনো কোথাও হয় নি।

যেমন বিরাট তেমনি আনন্দপূর্ণ ছিল এই আয়োজন।

শুধু বাঙালী নয়--সারা ভারতের লোক আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এই উৎসবে। তিনি যে জাতির কবি। সকল ধর্মের লোকই সমবেত হয়েছিল এই উৎসবে--তিনি যে সর্বধর্মের মিলনের বার্তাবহ। রাজা মহারাজা, ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবি, ঐতিহাসিক, শিল্পী, অধ্যাপক—যে যেখানে ছিল সবাই এই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়ে ধন্য হোল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এলো শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী তাই একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। কবির জীবনেও এটি

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই উপলক্ষে উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে The Golden Book of Tagore কবিকে উপহার দেওয়া হোল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও গুণী ও সাহিত্যিকের রচনা ও প্রশস্তি সংগ্রহ করে এ শ্রেণীর গ্রন্থ এদেশে এর আগে কখনো মুদ্রিত হয় নি। সে-গ্রন্থের প্রত্যেকখানি কপিতে ছিল কবির স্বাক্ষর। এমন ভাবে কবি-সম্বর্ধনা পৃথিবীর ইতিহাসেও নূতন।

উৎসবের দিন সে কী সমারোহ! টাউন হলে সমবেত পাঁচ হাজার লোক। শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে উৎসবমণ্ডপে প্রবেশ করলেন সৌম্যমূর্তি কবি। সে-দৃশ্য অপূর্ব। সুশোভিত মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অপরূপ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ভুবনভুলানো সে ছবি দেখে সার্থক হোল সকলের নয়ন। তাঁরই রচিত— জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা —গানটি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হোল। টাউনহলের বিরাট অভ্যন্তরটি বহু কণ্ঠের মিলিত সুরে-তালে গম্‌গম্ করতে লাগল। সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে। তারপর কবিকে অর্ঘ্য দেওয়া হলো। বিচিত্র সে অর্ঘ্যের উপকরণ— চন্দনফুলের মালা, জলশঙ্খ, ধূপদীপদূর্বা—এইসব। দুটি কিশোরী কবির দুপাশে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করছিল। হলের ভিতরটি আমোদিত ও সৌরভ-ময় হয়ে উঠলো ফুলের আর ধূপের গন্ধে। কবির সভা-আলো-করা শান্ত সমুজ্জ্বল মূর্তি। সে কী অপূর্ব দৃশ্য! যেন এক মহামহিম সম্রাটের দিগ্‌বিজয়ের উৎসব। যেন এক মহারাজাধিরাজের অভিষেক উৎসব। সংস্কৃতে প্রশস্তি-পাঠ হোল : 'যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচি বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই তাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান, এবং যিনি সত্যেই নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরাম জয় হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তিলাভ করুক।'

তারপর এলো অভিবন্দনের পালা।

বহু সভাসমিতি ও বহু প্রতিষ্ঠান কবিকে দিল অভিবন্দনের অর্ঘ্য।

এক মঞ্চের উপর বসে দুই হাত দিয়ে কবি গ্রহণ করেন সেসব শ্রদ্ধার দান। তার কোনোটি বা রূপার ফলকে সোনার অক্ষরে লেখা, কোনোটি বা তামার ফলকে খোদাই করা, আবার কোনোটি বা সোনার ফলকে এনামেলের ওপর লেখা। বিশ্বকবির হাতে দেবার মত করে পরিপাটি ও সুন্দর করে তৈরি। শহরের পুরবাসীদের পক্ষ থেকেও অভিনন্দিত করা হোল কবিকে। বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরাও নিবেদন করলো কবিকে তাদের প্রাণের অভিনন্দন এই উপলক্ষে। সমগ্র বাঙালীর পক্ষ থেকে কবিকে দেওয়া হোলো শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। সে-মানপত্র রচনা করেছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। সেই স্মরণীয় মানপত্রে কবির উদ্দেশে বলা হোল : 'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। বাণীর দেউল আজ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ...আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি।'

কবির হৃদয়কে স্পর্শ করল এইসব শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতির নিবেদন। প্রসন্নমনে তিনি গ্রহণ করলেন সেসব।

কবি দিলেন প্রতিভাষণ। বললেন : 'আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধুলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী উৎসবের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেম।...দেশ যার মধ্যে আপন ভাগ্যবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজন সমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ

রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম। আমার জীবনের সমাপ্তি দশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে।...আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ-কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। ...আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজো প্রবৃত্ত আছি।

'আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনার কী ইঙ্গিত আছে।'

সকলের ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে কবি বললেন:

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমিষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

নানা বিচিত্র কর্মের ভিতর দিয়ে আরো দশটি বছর অতিক্রান্ত হোল। কবি আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

অস্তাচলগামী রবি এখন অতীতকে দেখছেন মনশ্চক্ষের সামনে। 'শরীর অসুস্থ, কানে কম শোনেন, চোখেও কম দেখছেন; কিন্তু মন এখনো সবল সুস্থ। মনের মধ্যে সবার অগোচরে বয় স্রোতের ধারা—সেই ধারাপথে আসেন নূতন কাব্যলক্ষ্মী 'প্রহাসিনী' নূতন হাসির পাথেয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথ আজ শিশু ভোলানাথ। গরলমথিত বিশ্বসংসার আজ তিনি বিস্মৃত হতে চান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে ডক্টর উপাধি দিল—জীবনের শেষ সম্মানলাভ।

আশির কোঠায় পা দিয়ে কবি বললেন: 'সেই একদিন তখন বালক ছিলাম। জানিনে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। যদিও সে আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা কবেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম।'

জীর্ণ দেহ, ক্লান্ত মন।

তবু অস্তাচলগামী রবির অনুরাগ এই পৃথিবীর সকল তুচ্ছতাকে দুর্লভতর, রঙীনতর করেছে।

একদিন তিনি জীবনের যাত্রারম্ভে 'নানাবর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের

যে বাঁশিখানি' কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই বাঁশরীর কলধ্বনিত গানে উৎসারিত হয়েছে কবিসত্তার হৃৎস্পন্দন। তাঁর বীণার রুদ্রতালে শুধু কবির অন্তরবেদনা নয় অনন্তের আনন্দবেদনাও হয়েছে মুখরিত। বিরাটের প্রাণস্পন্দনকে ভাষা দিয়েছেন বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। আজ, জীবনসন্ধ্যায় কবির জীবনসঙ্গীত শমে এসে দাঁড়ালো। জীবন দেবতার পদপ্রান্তে সমর্পন করলেন সেই বাঁশি এই বলে ঃ

এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে,— একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,— এই মোর রহিল প্রণাম॥

পশ্চিম আকাশতটে অস্তগামী সূর্যের যে বর্ণসমারোহ আমরা প্রত্যক্ষ করি, রবীন্দ্রমানসের শেষ পর্যায়ে বিচ্ছুরিত সেই অনির্বচণীয় বর্ণদীপ্তি। মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি এসে কবিচিত্তপটে চেতনাবচেতনের আলো-আঁধারিতে যে বিচিত্র ভাবের আলিম্পন অঙ্কিত হয়েছিল, 'প্রান্তিক' কাব্যে আছে তারই প্রকাশ। জীবন ও মৃত্যু এখানে এক হয়ে গিয়ে কবির মনে এসেছে মুক্তির প্রশান্তি। আজ কবিসত্তা সহমরণের বধূ। তারপর রোগমুক্তির পর কবিদৃষ্টিতে রূপের জগতে আপন স্বরূপ নূতন করে দেখা দিল 'সেঁজুতি' কাব্যে।

অন্ধ তামস গহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।

'আকাশপ্রদীপে' তিনি জ্বালালেন তাঁর কৈশোরস্মৃতির স্নিগ্ধ দীপাবলী। দীর্ঘজীবনের দিনগুলি আজ পশ্চিমদিগন্তে লীন হয়ে আসছে। কিন্তু 'নবজাতকে' রবীন্দ্রনাথের এক নূতন ছবি। শান্তির কবি, পরিপূর্ণতার কবি, সৌন্দর্যের কবি এবার আবাহন করলেন রুদ্র আর পরুষের।

অভিনন্দন জানালেন নিষ্ঠুর পরুষকে। আজ তিনি মহেন্দ্রের তপোভঙ্গ দূত নন। আজ তিনি রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে তাঁর গান শেষ করতে চাইলেন। ললিতমধুর কল্পনা নয়, তীক্ষ্ণ রূঢ় পৌরুষ—নবজাতকের কবি সত্যই এক নূতন রবীন্দ্রনাথ। সভ্যতার আবর্জনার উপর, দেশের মূঢ়তার ও বিদেশের ক্রুরতার প্রতি তিনি বর্ষণ করেছেন ধিক্কার আর ভর্ৎসনা। উদ্‌ঘাটিত করলেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অন্তর্গূঢ় বর্বরতা। অগণিত নরনারীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে কবি আজ সচেতন। আজ তাঁর কণ্ঠে তুচ্ছজীবনের স্তবগান ঝঙ্কৃত—তুচ্ছের মধ্যে আজ তিনি খুঁজে পেয়েছেন কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা। আগামী দিনের কবিকে তিনি আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন ঃ

জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গনতলে লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

জীবনসায়াহ্নে কবি জনতার যুগযুগব্যাপী জীবনযাত্রাকে দেখলেন মহাকালের বিপুলতরঙ্গের অশ্রান্ত প্রবাহ হিসাবে। এই বিপুল জনতার দল মানুষের নিত্য প্রয়োজনের দাবী মেটায়, এরা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। এদেরই ললাটে অঙ্কিত হয়েছে মহাকালের বিজয় টীকা। মহাকালের নির্মুক্ত দৃষ্টি দিয়েই কবি দেখলেন বর্তমান যুগের হিংসা, অবিচার ও অত্যাচারকে। নামহীন, খ্যাতিহীন জনতার জীবনযাত্রা আর কোনো কবির কল্পনায় এমন অপরূপ অভিব্যক্তি পায় নি, মহাকালের সুবিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে আর কোনো কবি জনতাকে দেখেন নি—যেমন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। নবজাতকে কবির অনুভবের বিস্তৃতি আর প্রকাশের বর্ণবহুলতা সত্যই বিস্ময়কর।

'শেষ সপ্তকে' সেই অনুভবের শেষ সমারোহ।

কবির কল্পনাদৃষ্টিপথে এখন প্রসারিত নক্ষত্রলোকের সুবিস্তীর্ণ প্রতিবেশ।

অসীম আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করছে; অপরিমেয় আকাশের তুলনায় সেগুলি যেন পতঙ্গ। কালের গতি অশ্রান্ত। তার বিস্তৃতির সঙ্গে বিজড়িত জটিল রহস্য। মানবের ইতিহাস আর ব্যক্তির প্রাণলীলাকে অভিনব তাৎপর্য দান করেছে সেই রহস্য। ইতিহাসের রঙ্গস্থলে কবি প্রত্যক্ষ করলেন সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভিনয়। কবি উপলব্ধি করলেন, মানুষের হৃদয়ের প্রাণস্রোত ক্ষণজীবি নয়, তা অমৃত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত, তাই তা অবিনশ্বর। এই প্রাণলীলার রহস্যকেই ব্যক্ত করলেন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে। কবি বললেন, এ সেই রহস্য :

> যে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে
> চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

রবির জীবনে এলো অস্তলগ্ন।

জীবনসিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন মৃত্যুর নাট।

সত্তর বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন ছেড়ে কবি এলেন কলকাতায়—এলেন সেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে—যে-বাড়িতে একদিন তিনি প্রথম চোখ মেলেছিলেন। এবার তাঁর শেষযাত্রা আসন্ন। কালের দক্ষিণ হস্তের স্পর্শলাভ করেছেন তিনি। মৃত্যুশয্যায় রচনা করলেন শেষ কবিতা—সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রীকে আহ্বান করলেন ছলনাময়ী রূপে। তারপর এলো বাইশে শ্রাবণের সেই রাখীপূর্ণিমা। দিনের সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে। মাটির সূর্য অস্ত গেল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির একটি ঘরে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল রবীন্দ্রনাথের। নূতন গাছের চাঁপা ফুল অঞ্জলিভরে এনে তাঁর পা দুখানির উপর ছড়িয়ে দেওয়া হোল। তাঁর মুখের রঙে চাঁপার রঙে যেন মিশে গেল। শাদা

বেনারসী জোড় পরিয়ে ভালো করে সাজিয়ে দেওয়া হোল কবিকে। কোঁচানো ধুতিটি, গরদের পাঞ্জাবি, পাটকরা চাদরটি গলার নীচে থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো—কপালে শ্বেতচন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, দু'পাশে শাদা ফুলের রাশি—বুকের উপর হাতের মধ্যে একটি পদ্মের কুঁড়ি। রাজবেশে সম্রাট ঘুমোচ্ছেন। সম্রাটই তো—ভাবের ভুবনের অদ্বিতীয় সম্রাট।

গঙ্গার ও-পারে অস্ত গেল দিনের রবি।
এ-পারে ডুবলো বাংলার গৌরব-রবি।
মুছে গেল ভারতের ললাটের পুণ্য জয়টিকা।
ধরণীর বুকে রইলো শুধু :
'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা'।